

কিশোর কাল

রকিব হাসান

ছায়াশহর



Banglapdf.net Presents

কিশোর ক্লাব ছায়াশহর রকিব হাসান

কতগুলো ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে একসারি কবরফলকের পাশ দিয়ে। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

কবর থেকে উঠে এল নাকি?

দ্রুত হেঁটে চলেছে সবাই। মনে হচ্ছে সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালের ওপর দিয়ে ভেসে নেমে যাচ্ছে গাছের ছায়ার দিকে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। একটাই লক্ষ্য সবার, সুতোর টানে পুতুলের মত এগিয়ে চলেছে, যেন কোনও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ওদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

‘কেমন অদ্ভুত, তাই না!’ ফিসফিস করে সুজা বলল।

ছায়ার মধ্যে যেন ঢেউ তুলেছে কালো ছায়ামূর্তিগুলো। দৃশ্যটা সত্যিই অদ্ভুত। দেখে মনে হচ্ছে গোরস্থানের গাছপালা, কবরফলক, সব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। নতুন-পুরানো সমস্ত লাশেরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে চলেছে যেন কোনও নারকীয় মহাউৎসবে যোগ দিতে যেখানে চলবে রক্তের হোলিখেলা।

তিয়াত্তর টাকা

ISBN 702360009-4



9 847023 600098



ক্যাথারিস পাবলিশিং

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা

ক্যাথারিস পাবলিশিং, ১৮২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই। - লেখক

কিশোর ক্লাব

ছায়াশহর

রকিব হাসান



ক্যারাক্সিস পাবলিশিং



ক্যাথার্সিস পাবলিশিং

প্রকাশক

মিজানুর রহমান

ক্যাথার্সিস পাবলিশিং

১৮২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ২০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কচি

মুদ্রণ

ক্যাথার্সিস এ্যাডকম

যোগাযোগের ঠিকানা

ক্যাথার্সিস পাবলিশিং

১৮২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

দুরালাপন : ০৬৬৬ ২৬১১ ৮৩৫

ISBN 702360009-4

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা

Kishore Club

CHAYASHOHOR

By Rakib Hasan

*No part of this publication
may be reproduced in
whole or in part or
transmitted in any form or
stored in a retrieval system
or by any means-
electronic, mechanical,
photocopying, recording or
otherwise without written
permission of the publisher.
For information regarding
permission contact to
Catharsis Publishing.*

একটি বিশেষ খবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থাগুলো জানাচ্ছে যে আধুনিক নগর জীবনে এক চিলতে বদ্ধ ঘরের মধ্যে শৈশব-কৈশোর অভিবাহিত করতে গিয়ে অধিকাংশ শিশু-কিশোরের কল্পনা শক্তি কমে গেছে। পড়ার বইয়ের গং ছাড়া এক কলমও বেশি লিখতে পারে না বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে। বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করেছেন, এমনভাবে চলতে থাকলে শিশু-কিশোরদের ক্রিয়েটিভিটি কমে এক সময় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। দেশে দেখা দেবে মেধার সংকট...

না, ওপরের খবরটি কোথাও প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়নি। তবে খবরটিতে যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে সেটি সত্যি। ইট-কাঠ-পাথরের তৈরী নগর কিংবা শহরের ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খোলা মাঠে দুরন্তপনায় মেতে ওঠার কিংবা উঠোনে বেনি দুলিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলার সুযোগ এখন খুবই সংকুচিত। সুস্থ বিনোদনের কোনো সুযোগ নেই। অথচ আছে গাদা গাদা পড়ার চাপ। আছে পরীক্ষার চোখ রাঙানি।

যান্ত্রিক জীবনের এই হাঁপ ধরানো ছক থেকে আমরা তোমাদের বের করে নিয়ে যেতে চাই কল্পনার জগতে। উন্মুক্ত করতে চাই তোমাদের মনের জানালা। আমাদের এই প্রচেষ্টায় সহযাত্রী হয়েছেন কিশোর সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ **রকিব হাসান**। তোমাদের অবসর রুদ্ধশ্বাস রহস্যভেদ আর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী দিয়ে ভরিয়ে দিতে কলম ধরেছেন তিনি। কিশোর ক্লাবে তার লেখা প্রতিটি কাহিনীই আলাদা। কোনো কাহিনীতে থাকবে জমাট রহস্যের তুখোড় আলপনা, কোনোটি ভরে থাকবে রোমহর্ষক ভূতুড়ে বর্ণনায়, কোনোটি পড়তে গিয়ে হাসতে হাসতে পেটে ধরে যাবে খিল, কোনোটি আবার মাতোয়ারা করবে দুঃসাহসিক অভিযানের নিখাদ শিহরণ দিয়ে। প্রত্যেকটি ঘটনার স্থান এবং প্রেক্ষাপট হবে ভিন্ন ভিন্ন। ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্রে কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্ক গোয়েন্দাকেও দেখা যাবে নায়ক হিসেবে।

পড়ার আনন্দে মুখরিত হোক তোমাদের কৈশোর।
রুদ্ধশ্বাস রহস্যভেদ ও দুঃসাহসিক অভিযানে ভরা

কিশোর ক্লাব-এ

তোমাদের স্বাগতম।



ক্যাথারিস পাবলিশিং

কিশোর ক্লাব সিরিজের পরবর্তী বই

ভূতুড়ে রক্ত
রহস্যছাউনি
বিপদসংকেত

ছায়াশহর





এক

নতুন বাড়িটা পছন্দ হলো না আমার। সুজা তো আরও অপছন্দ করল।

তবে বাড়িটা বিশাল। আমাদের আগের বাড়িটার তুলনায় প্রাসাদ। লাল ইটের বাড়ি। ঢালু করে বানানো টালির ছাত। কালো রঙ করা। জানালার ফ্রেমগুলোতেও কালো রঙ।

ভিতরে ভীষণ অন্ধকার হবে, রাস্তা থেকেই মনে হয়েছিল আমার। বাড়ি ঘিরে কালো ছায়া। প্রচুর গাঁটওয়ালা বিকৃত চেহারার প্রাচীন গাছগুলো বাড়ির ওপর নুয়ে থেকে যেন বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে।

শেষ শরতের বাদামী রঙের ঝরা পাতা বিছিয়ে রয়েছে বাড়ির সামনের উঠানে। আমাদের জুতোর নীচে পড়ে মড়মড় শব্দে গুঁড়ো হচ্ছে।

আগাছা উঁকি দিচ্ছে মরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে। সামনের উঠানের পাশে বাগানের পুরানো একটা মস্ত ফুলের বেড এখন আগাছার নীচে ডুবে গেছে।

ভূতুড়ে বাড়ি ভেবে মন খুঁতখুঁত করতে থাকল আমার।

সুজার মনেও বোধহয় একই ভাবনা। প্রাচীন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দুজনেই গুণ্ডিয়ে উঠলাম।

স্থানীয় রিয়াল ইস্টেট অফিস থেকে জমি বেচাকেনার দালাল মিস্টার জোনস এসেছেন আমাদের সঙ্গে। হাসিখুশি, আন্তরিক। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি।

‘কী?’ ভুরু নাচিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ‘কেমন লাগছে তোমাদের নতুন বাড়ি?’

‘ওদের জিজ্ঞেস করে লাভ নেই,’ হেসে জবাব দিল বাবা। ‘ওদের ভাল লাগবে না। আগের জায়গাটা ছেড়ে আসতে মোটেও রাজি ছিল না ওরা।’ শার্টের নীচের অংশ বেরিয়ে চলে এসেছে অনেকখানি। প্যান্টের ভিতর গুঁজে দিল আবার। পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে বাবার। ওজন বাড়ছে। প্যান্টের ভিতরে আর থাকতে চায় না শার্ট।

‘ভাল লাগার কথাও না,’ মিস্টার জোনসের দিকে তাকিয়ে হাসল মা। ‘নতুন জায়গা। তা ছাড়া এত বছরের পুরানো বন্ধুদের ফেলে এসেছে। খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক।’

‘শুধু খারাপ না, জঘন্য লাগছে!’ মুখ বাঁকাল সুজা। ‘এ রকম পচা বাড়ি জীবনে দেখিনি আমি।’

হেসে সুজার পিঠ চাপড়ে দিলেন মিস্টার জোনস, ‘পুরানো ঠিকই, তবে পচা নয়।’

‘অনেক দিন কেউ থাকে না তো এখানে,’ সুজাকে সান্ত্বনা

দেয়ার জন্যে বাবা বলল। ‘ভাঙাচোরা জায়গাগুলো মেরামত করে নতুন রঙ লাগালেই দেখো আবার ঝলমল করে উঠবে। তখন ভাল লাগবে।’

‘না, লাগবে না!’ মুখটাকে গোমড়া করে রাখল সুজা।

‘কতবড় বাড়ি, কত জায়গা,’ মা-ও ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল। ‘বড় বড় ঘর। থাকার জন্যে আলাদা ঘর পাবে। শুধু খেলার জন্যেই পুরো একটা ঘর পেয়ে যাবে।’ আমার দিকে তাকাল মা। ‘রেজা, তোমার নিশ্চয় খারাপ লাগছে না?’

জবাব দিলাম না। দিতে ইচ্ছে করল না। ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপুনি তুলে দিয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। অথচ এখন গ্রীষ্মকাল। চমৎকার, গরম একটা দিন। যতই বাড়িটার কাছাকাছি এগোলাম, ঠাণ্ডা আরও বাড়ল।

বড় বড় পুরানো গাছগুলোর ছায়ার কারণেই বোধহয়।

মোটাকপড়ের শার্ট পরেছি আমি। গাড়িতে রীতিমত গরম লাগছিল। কিন্তু এখন জমে যাচ্ছি। ভাবলাম, ঘরের ভিতরে হয়তো গরম লাগতে পারে।

‘বয়েস কত ওদের?’ সামনের উঠানে পা রেখে মাকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জোনস।

‘রেজার বারো। এক মাস আগে সুজার এগারো পেরিয়েছে।’

‘দেখে কিন্তু সমানই লাগছে,’ মিস্টার জোনস বললেন।

কথাটা অবশ্য ভুল বলেননি তিনি। সুজা আর আমি দুজনেই প্রায় একসমান লম্বা। আমার কালো চুল, সুজার সোনালি।

‘আমি বাড়ি যেতে চাই,’ রুক্ষকণ্ঠে বলল সুজা। ‘এখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না।’

ভীষণ অধৈর্য ও। প্রচণ্ড জেদি। কোন কিছু নিয়ে গোঁ ধরলে

ছাড়ানো কঠিন। কোন কিছুর জন্য বায়না ধরলে না দিয়ে আর নিস্তার নেই। আদর পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। আমি অন্তত তাই মনে করি।

আমাদের চেহারার অনেক মিল থাকলেও স্বভাব আলাদা। সবাই বলে, সুজার চেয়ে আমার ধৈর্য বেশি। জেদিও নই। সম্ভবত আমি ওর চেয়ে বয়েসে বড় বলেই।

বাবার হাত ধরে টেনে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে চাইল সুজা। ‘বাবা, চলো। অ্যাই বাবা।’

আমি জানি, বাবা ওর কথা শুনবে না। এতবড় বাড়ি বিনে পয়সায় পেয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। বাবার এক দূর সম্পর্কের নিঃসন্তান চাচা উইল করে বাড়িটা দিয়ে গেছেন বাবাকে।

উকিলের কাছ থেকে যখন চিঠিটা পেল বাবা, আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছিল। অবাক লেগেছিল আমার। বাবাকে এত খুশি হতে দেখিনি কখনও।

‘এই শোনো, আমার দূর সম্পর্কের এক চাচা, মবিন চাচা, একটা বাড়ি দিয়ে গেছেন আমাকে,’ বার বার চিঠিটা পড়তে লাগল বাবা। ‘গ্রীন ভ্যালি নামে একটা শহরে।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বাবা।

বাবার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে চিঠিটা দেখছে মা। ‘ওই নামে তোমার কোন চাচা ছিলেন বলে তো শুনিনি কখনও।’

‘আমিই কী ছাই গুনেছি নাকি,’ বাবা জবাব দিয়েছে। ‘আমি না শুনলেও তিনি জানতেন, আমার খোঁজ-খবর রাখতেন। আমি ছাড়া আর বোধহয় কেউ ছিল না তাঁর। মৃত্যুর আগে ভাতিজাকে দান করে দিয়ে গেছেন বাড়িটা।’

লেখক হবার একটা অদম্য বাসনা চিরকালই সুপ্ত ছিল বাবার

মনে । সব সময় সুযোগ খুঁজত একঘেয়ে চাকরিটা ছেড়ে পুরোপুরি লেখার জগতে আত্মনিয়োগ করার । বাড়িটা পাওয়াতে সেই সুযোগ এসে গেল তার । এত আনন্দ সে-কারণেই ।

চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহ পর গ্রীন ভ্যালিতে এলাম আমরা । আমাদের পুরানো শহর থেকে গাড়িতে করে চার ঘণ্টা লাগল । বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে ঘরেও ঢুকতে চাইল না সুজা, প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করে বাধা দেয়া শুরু করল । বাবাকে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইল ।

বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল বাবা, ‘আহ, কী শুরু করলে!’ ঝাড়া দিয়ে সুজার হাতটা ছাড়িয়ে নিল ।

অসহায় ভঙ্গিতে মিস্টার জোনসের দিকে তাকাল বাবা । সুজা তাকে অস্থির করে তুলেছে । ভাবলাম, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি ।

সুজার হাত ধরে টান দিলাম । ‘সুজা, এখানে আসার আগে কী কথা ছিল আমাদের, ভুলে গেছ? আমরা ঠিক করেছিলাম, গ্রীন ভ্যালিতে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব আমরা ।’

‘মানিয়ে নিতে পারব না । দেখেই বুঝে গেছি,’ গুঙিয়ে উঠে আবার বাবার হাত আঁকড়ে ধরল সুজা । ‘বাড়িটা একটুও ভাল লাগছে না আমার । এখানে আমি থাকতে পারব না ।’

‘ভিতরেই তো ঢোকোনি, থাকতে পারবে না কী করে বুঝলে?’ রেগে উঠল বাবা ।

হাসলেন মিস্টার জোনস । ‘ভিতরে চলো । দেখো আগে । তারপর থাকতে পারবে কি না ভাবো ।’ সুজার হাত ধরলেন তিনি ।

‘না, আমি যাব না,’ ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সুজা । মাঝে মাঝে এত গোয়াতুঁমি করে ও । অন্ধকার, বিশাল বাড়িটা

আমারও পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে সুজার মত এমন তো করছি না।

‘সুজা, ভিতরে যাও। যে ঘরটা তোমার ভাল লাগবে, সেটাই দেয়া হবে তোমাকে,’ মা বলল।

‘না,’ মাথা নাড়ল সুজা।

দোতলার দিকে তাকালাম। পাশাপাশি বড় বড় দুটো জানালা। দুটো কালো চোখের মত তাকিয়ে রয়েছে যেন আমাদের দিকে।

‘যে বাড়িটা ছেড়ে এলেন সেটাতে কতদিন ছিলেন?’ বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জোনস।

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্ত ভাবল বাবা। ‘এই চোদ্দ বছর। রেজা আর সুজা ওখানেই জন্মেছে। ওদের সারাটা জীবন ওখানেই কেটেছে।

‘হুঁ, পুরানো জায়গা ছেড়ে আসতে খারাপই লাগে,’ সহানুভূতির সুরে বললেন মিস্টার জোনস। আমার দিকে তাকালেন। ‘রেজা, শোনো, মাত্র কয়েক মাস আগে গ্রীন ভ্যালিতে এসেছি আমি। প্রথম প্রথম আমারও ভাল লাগেনি। কিন্তু এখন এত ভাল লাগে, দুনিয়ার আর কোনখানেই থাকতে পারব না আমি।’ হাসলেন তিনি। হাসলে গালে টোল পড়ে। পুরুষমানুষের গালে টোল পড়াটা কেমন বেমানান। ‘চলো, ভিতরে চলো। ভাল লাগবে। আমি বলছি।’

মিস্টার জোনসের পিছন পিছন এগোলাম আমরা। সুজা দাঁড়িয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল, ‘অন্য ব্লকগুলোতে আর কোন ছেলেমেয়ে নেই?’

‘নিশ্চয় আছে,’ মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার জোনস। ‘দুই ব্লক দূরেই স্কুল। ওখানে গেলেই অনেকের সঙ্গে দেখা হবে।’ হাত

তুলে রাস্তার দিকে দেখালেন তিনি।

‘দেখলে, কত সুবিধে?’ হাসিমুখে মা বলল। ‘হেঁটেই স্কুলে যেতে পারবে। রোজ রোজ বাসে চড়ার ঝামেলা নেই।’

‘বাস আমার ভাল লাগে,’ সুজা বলল।

সহজে বাবা-মাকে নিস্তার দেবে না ও, বুঝলাম।

এই বাড়ি বদলানো আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু জানি, এতবড় একটা বাড়ি বিনে পয়সায় পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের আগের বাড়িটা এত ছোট, গাদাগাদি করে বাস করতে হয়। বাবা ঠিক করেছে ওটা বিক্রি করে দেবে। ছোট হলেও বাড়িটা এমন জায়গায়, বিক্রি করলে ভাল টাকা পাওয়া যাবে। তাতে এখনকার চেয়ে অনেক স্বচ্ছলভাবে চলতে পারব আমরা। কিন্তু সে-কথা সুজাকে বোঝায় কে?

হঠাৎ ড্রাইভওয়ার মাথায় রাখা আমাদের গাড়ির ভিতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কিটু।

কিটু আমাদের কুকুর। সাদা রঙের কোঁকড়া লম্বা লোমওয়ালা টেরিয়ার। খুব সুন্দর। গাড়িতে একা রেখে এলে কখনই চঁচামেচি করে না। কিন্তু এখন চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে। জানালার কাচ আচড়াচ্ছে। বেরিয়ে আসার আশ্রাণ চেষ্টা করছে।

‘কিটু, থাম, থাম! চুপ কর!’ চিৎকার করে বললাম। আমার কথা শোনে কুকুরটা।

কিন্তু এখন শুনল না।

‘বেরোতে চায়,’ সুজা বলল। ‘বের না করলে আর চুপ করবে না।’ গাড়ির দিকে পা বাড়াল ও।

‘না। দাঁড়াও...’ বাবা বলল।

কিন্তু কিটুর চিৎকারেই বোধহয় বাবার কথা কানে ঢুকল না

সুজার।

‘দিক না ছেড়ে, কুত্তাটাও ঘুরে দেখুক,’ মিস্টার জোনস বললেন। ‘ওকেও তো থাকতে হবে এখানেই।’

দরজা খুলে দিতেই লাফিয়ে বেরিয়ে এল কিটু। লনের ওপর দিয়ে দৌড়ে এল। ওর পা লেগে শুকনো পাতা উড়ছে। উত্তেজিত চিৎকার করতে করতে আমাদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন করতে লাগল যেন কতকাল আমাদের দেখেনি। মিস্টার জোনসের ওপর চোখ পড়তে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়ানক গজরানো শুরু করল। অবাক লাগল আমার।

‘কিটু! চুপ!’ ধমক লাগাল মা।

‘আশ্চর্য! এরকম তো কখনও করে না!’ মিস্টার জোনসের দিকে তাকাল বাবা। ‘ওর স্বভাব খুব ভাল।’

‘আমার গায়ে বোধহয় ভূতের গন্ধ পেয়েছে,’ রসিকতা করলেন মিস্টার জোনস। সতর্ক দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থেকে টাইয়ের গিঁট টিল করে দিলেন।

কিন্তু কিটু আর শান্ত হয় না। শেষে ওকে তুলে নিয়ে মিস্টার জোনসের কাছ থেকে সরে গেল সুজা। নাকে নাক ঠেকিয়ে চোখে চোখে তাকিয়ে ধমক লাগাল, ‘থামবি তুই! মিস্টার জোনস আমাদের বন্ধু।’

কুঁই কুঁই করে সুজার নাক চেটে দিল কিটু। আবার ওকে মাটিতে নামিয়ে রাখল সুজা। মিস্টার জোনসের দিকে তাকাল কিটু, তারপর আমার দিকে। তারপর মাটিতে নাক নামিয়ে কীসের যেন গন্ধ ঝুঁকে ঝুঁকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল উঠানে।

‘ভিতরে চলুন,’ আঙুল চালিয়ে মাথার চুল সমান করলেন মিস্টার জোনস। কিটু বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাঁকে।

সামনের দরজার তালা খুললেন। শিপ্রং লাগানো পাল্লাটা ঠেলে ফাঁক করে আমাদের ঢোকান জন্য ধরে রাখলেন।

মা আর বাবার পিছন পিছন ঢোকান জন্য পা বাড়ালাম আমি।

‘আমি এখানেই থাকি,’ সুজা বলল।

ধমক দিতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল বাবা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আনমনে মাথা দুলিয়ে রাগটা দমন করল বোধহয়। বলল, ‘তোমার ইচ্ছে। যা ভাল লাগে তাই করো। বাইরে থাকতে যদি ভাল লাগে বাইরেই থাকো।’

‘আমি কিটুকে নিয়ে বাইরেই থাকব,’ সুজা বলল। কুকুরটা কী করছে দেখার জন্য মুখ ফেরাল। মরা ফুলের বেড ঝুঁকছে কিটু।

আমরা ঢুকলাম। পাল্লাটা ছেড়ে দেয়ার আগে সুজার দিকে তাকালেন একবার মিস্টার জোনস। ‘থাক, ওখানেই ও ভাল থাকবে।’ মৃদু হেসে যেন মা’র অস্বস্তি দূর করার জন্য বললেন কথাটা। পাল্লাটা ছেড়ে দিলেন। আপনাআপনি লেগে গেল শিপ্রং লাগানো পাল্লা।

কিটুর আচরণে অস্বস্তি বোধ করছে মা। ‘মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জেদ করে কুকুরটা!’ মা যেন কৈফিয়ত দিলেন মিস্টার জোনসকে। ‘এমন অদ্ভুত কাণ্ড সাধারণত করে না ও। আপনি কিছু মনে করবেন না।’

‘না না,’ মিস্টার জোনস বললেন। ‘বসার ঘরটা থেকেই গুরু করা যাক, কি বলেন?’ আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন তিনি। ‘এত বেশি জায়গা বাড়িটাতে, এত ছড়ানো আর খোলামেলা, অবাক না হয়ে পারবেন না। তবে কিছু মেরামত করতে হবে।’

বাড়ির প্রতিটি ঘর আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন

তিনি। উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বাড়িটা সত্যিই চমৎকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অসংখ্য ঘর। আর প্রায় প্রতিটি ঘরেই ক্লজিট। দেয়াল ঘেঁষে বানানো বড় আলমারির মত এগুলো, মনে হয় যেন ঘরের ভিতর হুঁচট ঘর, জিনিসপত্র রাখার জন্য। অনেক বড় একটা ঘর পছন্দ করলাম আমি। অ্যাটাচড্ বাথ। জানালার কাছে রাখা পুরানো মডেলের রকিং চেয়ার। তাতে বসে আরাম করে দুলতে দুলতে রাস্তাসহ বাইরের অনেকখানি দেখতে পাব।

সুজাটা জেদ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ভুল করেছে। এ-সব দেখলে ওর রাগ চলে যেত।

পুরানো আসবাবপত্র আর বাস্ক-পেটরায় ঠাসা চিলেকোঠা।

দেখতে দেখতে অর্ধেকটা ঘণ্টা যে কোন দিকে দিয়ে পার হয়ে গেল টেরই পেলাম না। এখন আর এত মন খারাপ লাগছে না।

‘সব তো দেখালাম,’ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার জোনস। পথ দেখিয়ে আমাদেরকে সামনের দরজার দিকে নিয়ে চললেন।

‘একটু দাঁড়ান, আমার ঘরটা আরেকবার দেখে আসি,’ উত্তেজিত স্বরে বললাম। একেক লাফে দু’তিনটে করে ধাপ ডিঙিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

‘জলদি এসো,’ পিছন থেকে ডেকে বলল মা। ‘মিস্টার জোনসের নিশ্চয় অন্য জায়গায় কাজ আছে।’

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে সরু বারান্দা দিয়ে আমার নতুন ঘরে। ‘বাপরে!’ চোঁচিয়ে উঠলাম। শূন্য দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো আমার কথা।

ঘরটা সত্যিই বিশাল। একধারের মস্ত জানালাটা-যেটার কাছে রকিং চেয়ার আছে-খুব পছন্দ হয়েছে আমার। জানালার কাছে

গিয়ে বাইরে তাকালাম। গাছের ফাঁক দিয়ে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ানো আমাদের গাড়িটা চোখে পড়ল। রাস্তার ওপাশে আরেকটা বাড়ি, অনেকটা আমাদের এই বাড়িটার মতই।

জানালায় অন্যপাশে দেয়াল ঘেঁষে আমার বিছানাটা পাতব ঠিক করলাম। আমার ডেস্কটা কোথায় রাখব তা-ও ঠিক করে ফেললাম। যাক, এতদিনে একটা কম্পিউটার রাখার মত ঘর পেয়েছি আমি।

আমার ঘরের ক্লজিটের দিকে তাকালাম। উঁচু ছাতে বাল্ব লাগানোর ব্যবস্থা আছে। পিছনের দেয়ালে অনেকগুলো চওড়া তাক, জিনিসপত্র রাখার জন্য।

দরজার দিকে এগোলাম। আগের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে যেসব পোস্টার আনব, তার কোনটা এ ঘরে লাগালে ভাল লাগবে ভাবছি, এ সময় চোখে পড়ল ছেলেটাকে।

এক মুহূর্তের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর ঘুরে বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল।

‘সুজা, শোনো!’ চৈঁচিয়ে উঠেও থেমে গেলাম। বুঝলাম, ছেলেটা সুজা নয়। যদিও এর চুলের রঙও সোনালি।

‘অ্যাঁই, শোনো!’ চৈঁচিয়ে বলে ছুটে বেরোলাম বারান্দায়। ঘরের বাইরে এসে বারান্দার এ মাথা ওমাথা দেখলাম। ‘অ্যাঁই, কোথায় তুমি?’

জবাব দিল না কেউ। লম্বা বারান্দাটা শূন্য। বারান্দার পাশের বন্ধ দরজাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

ভুল দেখলাম?

নীচতলা থেকে আমার নাম ধরে ডাকল মা। বারান্দার অন্ধকার মাথার দিকে আরেকবার তাকালাম। তারপর ছুটে নামতে

শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে ।

‘মিস্টার জোনস,’ নেমে এসে চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ বাড়িতে কি ভূত আছে?’

হেসে উঠলেন তিনি । যেন মস্ত রসিকতা করে ফেলেছি । ‘না, নেই,’ নীল চোখে হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি, ‘এ বাড়িতে ভূত নেই, তবে এই এলাকার অনেক বাড়িতেই নাকি আছে ।’

‘কিন্তু কী যেন দেখলাম মনে হলো!’ নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে আমার ।

‘ছায়া নড়তে দেখেছ,’ মা বলল । ‘এত গাছপালা, অন্ধকারে ডালপালার ছায়া তো নড়তেই পারে ।’

‘বাইরে গিয়ে সুজাকে বলো,’ বাবা বলল আমাকে । ‘মজা পাবে ও । এ বাড়িতে থাকার আগ্রহ পাবে । ইতিমধ্যে মিস্টার জোনসের সঙ্গে জরুরি কথাগুলো সেরে ফেলি আমরা ।’

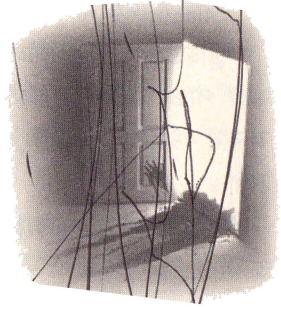
‘যাচ্ছি,’ বলে আবার ছুটলাম ।

বাইরে এসে থমকে দাঁড়লাম ।

কোথায় সুজা?

কিটুকেও দেখলাম না ।

দুজনেই গায়েব ।



দুই

‘সুজা! সুজা!’

প্রথমে সুজার নাম ধরে ডাকলাম। আরপর কিটুর নাম ধরে।
কিন্তু কেউই সাড়া দিল না।

দৌড়ে এসে গাড়ির জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম।
ওখানেও নেই ওরা। মা আর বাবা এখনও বাড়ির ভিতরে, মিস্টার
জোনসের সঙ্গে কথা বলছে। রাস্তার দুই পাশে তাকালাম।

নেই ওরা।

সুজাও নেই। কিটুও নেই।

‘সুজা! অ্যাই সুজা!’

অবশেষে মা-বাবা তাড়াহুড়ো করে সামনের দরজা দিয়ে

বেরিয়ে এল। দুজনেই শঙ্কিত। নিশ্চয় আমার চিৎকার শুনেছে। রাস্তা থেকে চেষ্টা করে বললাম, ‘সুজা আর কিটুকে খুঁজে পাচ্ছি না!’

‘বাড়ির পিছনে খুঁজে দেখেছ?’ বাবা জিজ্ঞেস করল।

ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটলাম। পায়ের খোঁচায় মাটিতে পড়ে থাকা ঝরা পাতা উড়ছে। রাস্তায় প্রচুর রোদ, বেশ গরম। কিন্তু যেই আবার উঠানে নামলাম, ছায়া ঢেকে ফেলল আমাকে। আবার ঠাণ্ডা।

‘অ্যাই সুজা! কোথায় তুমি?’ ডাকতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল আমার।

কিন্তু এত ভয় পাচ্ছি কেন আমি? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। সুজা তো এমনই। কাউকে না বলে যখন-তখন উধাও হয়ে যায়। বুঝলাম, জায়গাটা আমার স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করছে।

বাড়ির পাশ ধরে প্রাণপণে ছুটলাম। বড় বড় গাছ ঝুঁকে রয়েছে এই পাশটায়। রোদ প্রায় ঢুকতেই দিচ্ছে না।

দূর থেকে দেখে যতটা মনে হয়েছিল, পিছনের উঠানটা তারচেয়ে অনেক বড়। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা কাঠের বেড়ার কাছে। সামনের মতই পিছনের উঠানটাও বড় বড় আগাছায় ভর্তি। পুরু হয়ে জমে আছে বাদামী ঝরা পাতা। পাখিদের গোসল করার জন্য একটা পাথরের গামলা বানানো হয়েছিল, ঘাসের ওপর উল্টে পড়ে আছে এখন। ওটার অন্যপাশে একটা গ্যারেজের একপাশ চোখে পড়ছে। মূল বাড়িটার সঙ্গে মিল রেখেই যেন অন্ধকার হয়ে রয়েছে।

‘সুজা! সুজা!’

জবাব নেই। মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজলাম। কিংবা এমন কোন চিহ্ন, যাতে বুঝতে পারি ওরা কোনদিকে গেছে। পুরু হয়ে

জমে থাকা পাতায় কিছুই চোখে পড়ল না।

‘কী, পেলো?’ হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়াল বাবা।

‘নাহ্!’ এত উদ্ভিগ্ন হয়েছি কেন ভেবে অবাক লাগছে।

‘গাড়িতে দেখেছ?’ বাবার কণ্ঠে উদ্বেগের চেয়ে রাগ বেশি।

‘হ্যাঁ। প্রথমেই ওখানে দেখেছি।’ দ্রুত আরেকবার চোখ বোলালাম পিছনের উঠানটায়। ‘কোন কারণ ছাড়া এভাবে উধাও হয়েছে ও, বিশ্বাস করতে পারছি না।’

‘আমি পারছি,’ রাগত স্বরে বাবা বলল। ‘তোমার ভাইকে চেনো না? বাড়িটা পছন্দ হয়নি, তাই আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে।’

‘গেল কোথায় ও?’ আমরা সামনের আঙিনায় ফিরে এলে মা জিজ্ঞেস করল।

‘হয়তো কোন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, কথা বলতে বলতে চলে গেছে,’ বাবা জবাব দিল। বাদামী কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাল। চাঁদি চুলকাল। তার এ-সব ভঙ্গিই বুঝিয়ে দিচ্ছে উদ্ভিগ্ন হতে আরম্ভ করেছে।

‘কিন্তু খুঁজে তো বের করা দরকার,’ রাস্তার দিকে তাকাল মা। ‘একেবারেই নতুন জায়গা। কিছুই চেনে না। শেষে হারিয়ে না যায়!’

সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এলেন মিস্টার জোনস। চাবিটা পকেটে রাখলেন। ‘বেশিদূর যায়নি নিশ্চয়,’ মা’র দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। ‘চলুন, গাড়িতে করে ব্লকটা ঘুরে দেখে আসি। চিন্তা করবেন না। পাওয়া যাবে।’

বাবার দিকে তাকিয়ে মা বলল, ‘ওকে আমি মেরেই ফেলব আজ!’

আস্তে করে মা'র কাঁধ চাপড়ে দিল বাবা, যেন অভয় দিতে চাইল।

আমাদের ছোট গাড়িটার ট্রাংকের ডালা তুললেন মিস্টার জোনস। গায়ের গাঢ় রঙের রেলজারটা খুলে ছুঁড়ে ফেললেন ভিতরে। তারপর চওড়া কানাওয়ালা একটা কাউবয় হ্যাট বের করে মাথায় দিলেন। হ্যাটটা বিচিত্র, কালো রঙের কানা, মাথায় বসানোর জায়গাটা সাদা। ঘরে ঢোকার আগে এখানে রেখে গিয়েছিল হ্যাটটা।

‘আপনার হ্যাটটা কিন্তু দারুণ,’ গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল বাবা।

‘হ্যাঁ, রোদের মধ্যে খুব আরাম, মুখে রোদ লাগে না, সেজন্যেই পরি,’ মিস্টার জোনস বললেন। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে দরজা লাগালেন।

আমি আর মা বসলাম পিছনের সিটে। মা'র দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার মতই উদ্ভিগ্ন।

ব্লক ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। চারজনেই চুপচাপ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। যে সব বাড়িঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, সবই পুরানো। কিছু কিছু বাড়ি আছে, আমাদের বাড়িটার চেয়ে বড়। সবগুলোই বেশ ভাল অবস্থায় আছে। ঝকঝকে রঙ করা। সুন্দর করে ছাঁটা লন।

কোন বাড়িতেই মানুষ চোখে পড়ল না। না বাড়ির ভিতরে, না বাইরে। রাস্তায়ও কোন লোক দেখলাম না।

বড়ই নির্জন পরিবেশ, ভাবলাম। আর ছায়ায় ঢাকা। সবগুলো বাড়ি বড় বড় গাছে ঘেরা। গাছের ঘন পাতা অন্ধকার করে রেখেছে। রোদ যা দেখা যাচ্ছে, শুধু রাস্তায়ই। সোনালি সরু

একটা আঁকাবাঁকা ফিতের মত পড়ে রয়েছে যেন দু'পাশের ঘন ছায়ায় মাঝখানে।

এত অন্ধকার! জায়গাটার নাম গ্রীন ভ্যালি না রেখে ডার্ক ভ্যালি কিংবা ব্ল্যাক ভ্যালি রাখলে ঠিক হতো, ভাবলাম।

‘গেল কোথায় ছেলেটা?’ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল বাবা।

‘আমি ওকে মেরেই ফেলব আজ, দেখো!’ এই কথাটা এর আগেও বহুবার বলেছে মা। প্রচণ্ড রেগে গেলে এ রকম করে বলে।

পুরো রকমে দু'বার চক্কর দিলাম আমরা। সুজার ছায়াও চোখে পড়ল না।

পরের কয়েকটা রকও ঘুরে দেখার কথা বললেন মিস্টার জোনস। নীরবে মাথা ঝাঁকাল বাবা।

পথের একটা মোড় ঘুরতেই লাল ইটে তৈরি একটা উঁচু বিন্ডিং দেখালেন মিস্টার জোনস। বললেন, ‘ওই যে, স্কুল।’

অনেক পুরানো আমলের বাড়ি। বিশাল চওড়া দরজার দুই পাশে মোটা মোটা থাম। মিস্টার জোনস বললেন, ‘অবশ্য স্কুল এখন বন্ধ।’

স্কুলের পিছনে বেড়া দেয়া খেলার মাঠটা দেখলাম। ওটাও শূন্য। কেউ নেই।

‘এত তাড়াতাড়ি এত দূরে চলে এল সুজা?’ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মা’র কণ্ঠ।

‘ও কি আর হেঁটে চলে,’ বাবা বলল, ‘ও তো ওড়ে।’

‘চিন্তা করবেন না,’ মিস্টার জোনস বললেন, ‘ওকে খুঁজে বের করবই আমরা।’ স্টিয়ারিং হুইলে আঙুলগুলো চেপে বসল তাঁর।

আরেকটা ছায়ায় ঢাকা রকের মোড় ঘুরলাম আমরা।

রাস্তায় সাইনবোর্ড: *সিমেটারি ড্রাইভ*

‘গোরস্থানের রাস্তা,’ আনমনে বিড়বিড় করলাম। সামনে মস্ত এক গোরস্থান চোখে পড়ল। নিচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে সারি সারি কবরফলক। গোড়ার কাছে একটা চ্যাপ্টা উঁচু হয়ে থাকা সমতল জায়গাতেও অসংখ্য কবরফলক আর স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে।

প্রচুর ঝোপঝাড় আছে গোরস্থানে, তবে বড় গাছ তেমন নেই। ধীরে ধীরে গোরস্থানের পাশ দিয়ে এগোল আমাদের গাড়ি। বাঁ পাশে দ্রুত সরে যাচ্ছে কবরফলকগুলো, আবছা ঝিলিকের মত লাগছে। সারা শহরের একমাত্র এই জায়গাটাতেই প্রচুর রোদ আছে।

‘ওই যে আপনার ছেলে,’ জানালা দিয়ে হাত বের করে দেখালেন মিস্টার জোনস। আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

‘উফ, বাঁচা গেল!’ চৈঁচিয়ে উঠল মা। কাত হয়ে এসে আমার পাশের জানালা দিয়ে তাকাল।

নিচু, সাদা রঙ করা এক সারি কবরফলকের কিনার দিয়ে কেমন খেপার মত দৌড়ে চলেছে সুজা।

‘এখানে কী করছে ও?’ অবাক হয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। ঠেলে খুললাম আমার পাশের দরজাটা।

গাড়ি থেকে নামলাম। ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম কয়েক কদম। চিৎকার করে ডাকলাম ওকে। আমার ডাকে সাড়া দিল না সুজা। কবরফলকগুলোর পাশ দিয়ে দৌড়ানোর সময় মাঝে মাঝে ঝুঁকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে।

এ রকম করছে কেন?

আরও কয়েক পা এগোলাম। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে
যেন থেমে গেলাম। ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে এল।
ওভাবে পাগলের মত দৌড়ানোর কারণটা বুঝে গেছি। তাড়া
করেছে কেউ ওকে!



তিন

আবার কয়েক পা এগোলাম। সুজার দিকে নজর আমার।

আবার নিচু হয়ে কী যেন দেখল ও। দিক পরিবর্তন করল।
দুই হাত সামনে বাড়াল। বুঝলাম, উল্টো ভেবেছি আমি।

আসলে সুজাকে তাড়া করেনি কেউ, সুজাই কাউকে তাড়া
করেছে, কিংবা ধরতে চাইছে।

নিশ্চয় কিটুকে।

হুঁ! মা প্রায়ই বলে, মাঝে মাঝে আমার অতিকল্পনা মাত্রা
ছাড়ায়। তবে এ রকম একটা সময়ে এক বিশাল গোরস্থানে নিজের
ভাইকে ওভাবে ছুটতে দেখলে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক।

আবার সুজার নাম ধরে ডাকলাম। এবার আমার ডাক শুনতে
পেল ও। ফিরে তাকাল। উদ্ভিন্ন দেখাচ্ছে ওকে। চোঁচিয়ে বলল,
'ভাইয়া, জলদি এসো! আমি একা পারছি না!'

‘সুজা, কী হয়েছে?’ ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু আমি যত জোরে দৌড়াই, ও তারচেয়ে জোরে ছুটে আমার কাছ থেকে সরে যায়।

‘জলদি এসো!’ চেষ্টা করে বলল সুজা।

‘সুজা, ওভাবে দৌড়াচ্ছ কেন?’ বাবার চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার ঠিক পিছনেই রয়েছে বাবা। মা আসছে বাবার পিছনে।

‘কিটু,’ চেষ্টা করে জবাব দিল সুজা। হাঁপাতে হাঁপাতে অস্থির। ‘আমি ওকে থামাতে পারছি না। একবার ধরেছিলাম, কিন্তু ঝাড়া দিয়ে ছুটে গেল।’

‘কিটু! কিটু!’ বাবাও ডাকতে লাগল কুকুরটাকে। কিন্তু ফিরল না কিটু। থেমে থেমে প্রতিটি কবরফলক গুঁকে দেখছে, তারপর আবার ছুটেছে।

সুজার কাছে পৌঁছে গেল বাবা। জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে এলে কীভাবে?’

‘কিটুর পিছু নিয়ে,’ এখনও ভীষণ উদ্ভিগ্ন দেখাচ্ছে সুজাকে। ‘বাগানে ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ উঠে দৌড় দিল। কত ডাকা ডাকলাম, শুনল না। ফিরেও তাকাল না। সোজা এখানে চলে এল। আমাকেও ওর পিছন পিছন আসতে হলো। ভয় পাচ্ছিলাম, আমি না এলে হারিয়ে যাবে।’

কুকুরটাকে ধরতে গেল বাবা। সুজা আমাকে বলল, ‘ওই হাঁদা কুকুরটার কী হয়েছে বুঝলাম না। অদ্ভুত আচরণ করছে।’

বাবাও অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ধরতে পারল কিটুকে। তুলে নিল। খুদে টেরিয়ারটা চেষ্টা করে, শরীর মুচড়ে নেমে যেতে চাইল। কিন্তু বাবা কোনমতেই ছাড়ল না, শক্ত করে ধরে রাখল।

দল বেঁধে গাড়ির কাছে ফিরে গেলাম আমরা। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার জোনস। বললেন, ‘গলায় শিকল লাগাও ওটার।’

‘কিন্তু শিকল তো কোনদিন লাগাইনি,’ সুজা বলল। গাড়ির পিছনের সিটে উঠে বসল ও।

‘তবে এখন মনে হচ্ছে লাগাতে হবে,’ বাবা বলল। ‘এভাবে বার বার যদি দৌড়ে পালায়, তাহলে তো বিপদ। কে ওকে খুঁজবে এত?’ রাগ করে পিছনের সিটে কুকুরটাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল বাবা। সুজা ওকে কোলে তুলে নিল। বিনা প্রতিবাদে ওর কোলে গুটিসুটি হয়ে রইল কিটু।

কিটুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিলাম আমি।

গাড়িতে উঠলাম সবাই। আমাদেরকে তাঁর অফিসে নিয়ে চললেন মিস্টার জোনস।

এভাবে দৌড়ে পালাতে চাইল কেন কুকুরটা? অবাক লাগছে আমার। কখনও এ রকম অস্বাভাবিক আচরণ করেনি ও।

আমার মনে হলো, নতুন জায়গায় এসে ওরও ভাল লাগেনি। সারাটা জীবন আমাদের মতই একটা বাড়িতে থেকেছে ও। ওখানে থেকে চলে এসে হয়তো সুজার মতই খারাপ লাগছে, এই অপরিচিত পরিবেশ সহ্য করতে পারছে না।

নতুন বাড়িঘর, নতুন রাস্তা, নতুন নতুন সব গন্ধ নিশ্চয় ওকে ভড়কে দিচ্ছে। তাই ওসবের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চেয়েছিল। তবে আমার এই ব্যাখ্যা কতখানি ঠিক, জানি না।

এক সারি অফিসের শেষ প্রান্তে সাদা রঙ করা ছোট একটা ঘরে মিস্টার জোনসের অফিস। ওটার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাবার সঙ্গে হাত মেলালেন। একটা বিজনেস কার্ড দিলেন

বাবাকে। ‘আগামী সপ্তায় চলে আসবেন। কাগজপত্র সব রেডি করে ফেলব আমি ততদিনে। ওগুলো সই হয়ে যাবার পর যে কোন সময় এসে উঠতে পারবেন নতুন বাড়িতে।’

গাড়ির দরজা ঠেলে খুললেন তিনি। আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি উপহার দিলেন। তারপর নামার জন্য তৈরি হলেন।

‘গ্র্যাম্পারসন জোনস,’ বাবার হাতের কার্ডটার দিকে তাকিয়ে পড়ল মা। ‘এমন কঠিন নাম তো সাধারণত কেউ রাখে না। এটা আপনাদের পুরানো পারিবারিক নাম নাকি?’

মাথা নাড়লেন মিস্টার জোনস। ‘না, সারা পরিবারে আমিই একমাত্র গ্র্যাম্পারসন। হয়তো সবার থেকে আলাদা করতেই আমার বাবা-মা এমন একটা নাম রেখেছিল।’

এমন করে হাসলেন, যেন কী এক মহা রসিকতা করে ফেলেছেন। গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি। কপালের ওপর টেনে নামালেন সাদা-কালো স্টেটসন হ্যাটের চওড়া কানা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রোদ লাগলে চামড়ায় ফোসকা পড়বে। গাড়ির ট্রাংক থেকে ব্লেকারটা টেনে বের করে নিয়ে ঢুকে গেলেন সাদা অফিসটাতে।

সরে এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল বাবা। সিটটাকে পিছিয়ে নিল তার উঁচু ভুঁড়িটাকে জায়গা করে দেয়ার জন্য। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে চলে গেল মা।

বাড়ি ফিরে চললাম আমরা। শুরু হলো আবার চার ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রা।

‘তুমি আর কিটু তো ভাল একখান অ্যাডভেঞ্চার করে এলে,’ ফিরে তাকিয়ে সুজাকে বলল মা। পাশের জানালাটা তুলে দিল,

কারণ এয়ারকুলার চালু করে দিয়েছে বাবা ।

‘ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চার,’ সুজা বলল । ওর কোলে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন কুকুরটা । নাক ডাকাচ্ছে ।

‘নতুন বাড়িতে তোমার ঘরটা পছন্দ হবে, দেখো,’ সুজাকে বললাম । ‘সত্যিই ভাল । পুরো বাড়িটাই খোলামেলা ।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুজা । জবাব দিল না ।

কনুই দিয়ে ওর পাঁজরে আলতো গুঁতো দিলাম । ‘কী, কথা বলছ না কেন?’

‘কী বলব?’ যেন আমার কথায়ও নিশ্চিত হতে পারছে না সুজা ।

*

টিমেতালে গড়িয়ে চলল যেন পরের দুটো সপ্তাহ । প্রায়ই আমাদের বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াই আর ভাবি, মাত্র আর কয়েকটা দিন, তারপর কখনও আর এ বাড়িটা দেখতে পাব না । এই বাড়ির রান্নাঘরে আর কোনদিন বসে নাস্তা খাব না । লিভিং রুমে বসে টিভি দেখব না । ভাবনাগুলো মন খারাপ করে দেয় ।

মনটা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল, যেদিন বিকেলে মুভার কোম্পানির লোক এসে বড় বড় কতগুলো বাক্স রেখে গেল । এ-সব বাক্সে মাল ভর্তি করা হবে । তারমানে সত্যি সত্যি যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে । নিজের ঘরে এসে বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম । ঘুম এল না । ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকলাম । কত কথা কত স্মৃতি খেলে যাচ্ছে মনে । স্বপ্নের মত লাগছে ।

অস্থিরতায় আমি একাই ভুগছি না । বাবা-মাও কারণে-অকারণে ধমকাধমকি করছে, একজন আরেকজনের ওপর রেগে

উঠছে। একদিন সকালে মাংস বেশি ভাজা হয়ে গেছে—এ রকম অতি সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে বিরাট ঝগড়া বাধিয়ে বসল দুজনে।

ওদের এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে অবাকই লাগে। আর সুজার মুখ সারাক্ষণই গম্ভীর। কারও সঙ্গে কথা বলে না। কিটুর চেহারাও কেমন ভার ভার। বিষণ্ণ। আমি খাবার নিয়ে ডাকলে আর আগের মত দৌড়ে আসে না, উঠতে চায় না, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে।

সবচেয়ে কষ্ট লাগল পুরানো বন্ধুদেরকে বিদায় জানানোর সময়। ছুটিতে ক্যাম্পিঙে চলে গেছে ডন আর জোসেফ। চিঠি লিখে আমাদের চলে যাওয়ার কথা জানাতে হলো ওদের। তবে নেড বাড়িতেই আছে, ও আমার সবচেয়ে পুরানো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে বিদায় জানানোটাই বেশি কঠিন হলো আমার জন্য।

আমরা চলে যাবার আগের রাতে যখন এল নেড, আমার মন তখন ভীষণ খারাপ। ‘এত কষ্ট পাচ্ছ কেন?’

‘ও তুমি বুঝবে না,’ আমি বললাম। ‘তোমাকে তো আর এতকালের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে না চিরদিনের জন্যে।’

‘তোমার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছ,’ জোরে জোরে বাবলগাম চিবাচ্ছে নেড। বুঝলাম, অস্থিরতা চাপা দেয়ার জন্য ওরকম করছে। আমি চলে যাব তাই ওরও মন খারাপ, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চাইছে না। ‘যাচ্ছ তো গ্রীন ভ্যালিতে, এখান থেকে মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তা। শোনো, এত মন খারাপ কোরে না, আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হবে না।’

‘তা ঠিক,’ আমি বললাম। তবে বিশ্বাস করতে পারছি না। গাড়িতে করে চার ঘণ্টার পথ, বড়দের জন্য যা-ই হোক, আমার

জন্য কম না। বিষণ্ণকণ্ঠে বললাম, ‘তা ছাড়া মাঝে মাঝে টেলিফোনেও কথা বলতে পারব আমরা।’

বাবল গাম দিয়ে ঠোঁটের বাইরে সবুজ রঙের ছোট্ট একটা বল তৈরি করল নেড, আবার মুখের ভিতর টেনে নিল ওটা। প্রবল উৎসাহ দেখানোর ভান করল ও। ‘ভাগ্যটা বরং ভালই বলতে হবে তোমার, এ রকম একটা জঘন্য জায়গা থেকে মুক্তি পাচ্ছ। বড় বাড়িতে যাচ্ছ। ঠাসাঠাসি করে থাকতে হবে না আর।’

‘ভুল বললে। মোটেও জঘন্য নয় এ জায়গাটা,’ কেন যে এখানকার পরিবেশ ভাল বোঝানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি, নিজেও বুঝলাম না, কারণ এর আগে কখনও জায়গাটাকে এত ভাল মনে হয়নি আমার। বরং কেন আরও ভাল কোনখানে জন্মাইনি, এ নিয়ে কত আক্ষেপ করেছি দুজনে।

‘তোমাকে ছাড়া স্কুল আর আমার একটুও ভাল লাগবে না,’ চেয়ারের ওপর পা তুলে এনে মুড়ে বসল নেড। ‘অংকের ক্লাসে কে আমাকে উত্তরটা কী হবে কাগজে লিখে জানাবে?’

হেসে উঠলাম। ‘কাগজে তো সব সময় ভুল জবাবটাই লিখে দিয়েছি।’

‘তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি, দুজনেরই ভুল হচ্ছে, শুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি।’ গুণ্ডিয়ে উঠে নেড বলল, ‘ইস্, জুনিয়র হাই! জুনিয়র হাই স্কুলে পড়বে তুমি এখন, কী মজা! ওটা কি হাই স্কুলের অংশ?’

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালাম। ‘হবে হয়তো। এক বিন্ডিঙেই সব কিছুর। খুবই ছোট্ট শহর, বলেছি না? ওই একটা ছাড়া আর কোন স্কুল দেখিনি।’

‘ভাল না?’

‘কী জানি! না গেলে বুঝব কী করে?’ আসলে গ্রীন ভ্যালির আলোচনাই ভাল লাগছে না আমার।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একনাগাড়ে কথা বলে গেলাম আমরা। অনেক রাতে নেডের আম্মা ফোন করে ওকে বাড়ি যেতে বললেন।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা। মন শক্ত করলাম, যাতে কেঁদে না ফেলি। কিন্তু কোনমতেই চোখের পানি ঠেকাতে পারলাম না। চোখের দুই কোণে পানি জমতে লাগল, তারপর মোটা ধারায় গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

‘খুব কষ্ট লাগছে আমার!’ ফুঁপিয়ে উঠলাম।

ভেবেছিলাম, বড় হয়েছি, নিজেকে সামলাতে পারব। কিন্তু পারলাম না। কী করব? নেড আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

একে অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম আমরা, যেভাবেই হোক, দুজনে দুজনের জন্মদিনের পার্টিতে হাজির থাকবই। প্রয়োজনে আমাদের বাবা-মাকে নিয়ে যেতে বাধ্য করব।

তারপর আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। নেড বলল, ‘ভেবো না, অনেক দেখা হবে আমাদের। সত্যি।’ সে-ও আর চোখ শুকনো রাখতে পারল না।

আচমকা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দরজার দিকে দৌড় দিল ও। বেরিয়ে যেতেই দড়াম করে লেগে গেল স্প্রিং লাগানো পাল্লাটা। অন্ধকারে শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে ঢুকল কিটু। যেন বুঝতে পারল আমার মনের অবস্থা। মেঝেতে নখের শব্দ তুলে কুঁই কুঁই করে এসে আমার হাত চেটে দিল। বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চাইল আমাকে।

*

পরদিন শনিবার। আমাদের যাবার দিন। একটা বৃষ্টিভেজা সকাল।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না। বাজ পড়ছে না। বৃষ্টি হচ্ছে পিটির পিটির করে। মন খারাপ করে দেয়া বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। গাড়ি চালানো কঠিন করে তুলল বাবার জন্য। আমাদের যাত্রাটা হলো অসহনীয়।

নতুন জায়গার দিকে যতই এগোলাম, আকাশ ক্রমেই আরও বেশি অন্ধকার হয়ে এল। বাতাসে রাস্তার ওপর নুয়ে নুয়ে পড়ছে বড় বড় গাছের ডাল। রাস্তা পিচ্ছিল।

‘আস্তে চালাও,’ বাবাকে সাবধান করল মা। ‘রাস্তার যা অবস্থা, অ্যাক্সিডেন্ট করবে।’

বাবা তাড়াহুড়া করছে আমাদের মালবাহী ভ্যানটার আগে পৌঁছানোর জন্য। ‘আমরা সামনে না থাকলে যেখানে খুশি জিনিসপত্র ছড়িয়ে ফেলে চলে যাবে ওরা।’

প্রচণ্ড বিরক্ত করছে সুজা। ভাল লাগছে না, তাই। পিছনের সিটে আমার সঙ্গে বসেছে। প্রথমে ‘খুব পানি খেতে ইচ্ছে করছে’ বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকল। বোতল থেকে নিয়ে খেয়ে ফেললেই হয়, তাই কেউ কান দিল না। এরপর শুরু করল গোঙানি, ‘খিদেয় মরে গেলাম, উহু, খিদে!’ পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছি আমরা। খিদে লাগার কোন কারণই নেই, তাই এ কথায়ও কেউ কান দিল না।

যে বাড়িতে যাচ্ছি আমরা, সেটা কী বিশাল, ভিতরটা কত সুন্দর, কত বড় বড় ঘর, আর খোলামেলা, এ-সব বলে ওকে খুশি করতে চাইলাম।

কিন্তু খুশি হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মাঝে। আর কিছু না পেয়ে কিটুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল। বেচারী কুকুরটাকে কষ্ট দিতে লাগল। সহ্য করতে না পেরে শেষে চেষ্টা করে ওকে

থামতে বলল বাবা।

‘দেখো, বেশি বিরক্ত কোরো না,’ মা বলল। ‘বাড়ি থেকেই বলে এনেছি, জ্বালাবে না!’

জোর করে হাসল যেন বাবা, ‘ঠিক!’

‘তুমি কি আমাকে ইয়ার্কি মারছ নাকি?’ রেগে উঠল মা।

ব্যস, তর্ক বেঁধে গেল দুজনের। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে, চাপ পড়েছে বেশি, সেজন্যই বোধহয় এ রকম অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরাও। দুই পায়ে খাড়া হয়ে পিছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল কিটু।

‘থামাবি ওটাকে!’ চোঁচিয়ে উঠল মা।

পিছনের পা ধরে টেনে আনলাম কিটুকে। হউউ হউউ করে নেকড়ের ডাক ডাকতে শুরু করল সুজা। চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল মা। পাত্তাই দিল না সুজা। ওর ধারণা, সাংঘাতিক একটা কাণ্ড করে ফেলছে।

অবশেষে শেষ হলো আমাদের পথ, বাড়ির ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল বাবা। ভেজা সুরকিতে খড়খড় করে উঠল চাকা। গাড়ির ছাতে প্রচণ্ড শব্দ করছে বৃষ্টির ফোঁটা।

‘হোম, সুইট হোম,’ মা বলল। কথাটা মন থেকে বলল কি না, সন্দেহ হলো আমার। বরং এই পথযাত্রা শেষ হওয়াতেই বোধহয় স্বস্তি বোধ করছে মা।

‘যাক, মুভারদের আগেই আসতে পারলাম।’ ঘড়ির দিকে তাকাল বাবা। মুখে স্বস্তি। ‘ওরা এখন পথ ভুল না করলেই বাঁচি।’

‘দিন না রাত এখন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না,’ সুজা বলল, ‘এত অন্ধকার।’

আমার কোলে লাফানো শুরু করল কিটু। গাড়ি থেকে বেরিয়ে

যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। গাড়ি চললে জ্বালাতন করে না, কিন্তু যেই থামে, বেরোনোর জন্য অস্থির হয়ে যায়।

আমার পাশের দরজাটা খুলে দিলাম। ড্রাইভওয়েতে জমে থাকা পানির মধ্যেই এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবেঁকে দৌড় দিল সামনের আঙিনা ধরে।

‘যাক, এখানে এসে একজন অন্তত খুশি হয়েছে,’ সুজা বলল।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে এক দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল বাবা। পকেট থেকে চাবি বের করে সামনের দরজার তালা খুলল। হাত নেড়ে আমাদের ডাকল।

গাড়ি থেকে নেমে বাবার মতই দৌড় দিল মা ও সুজা। আমি নেমে দরজা লাগিয়ে ওদের পিছনে ছুটলাম।

কী যেন চোখে পড়ল। থেমে গেলাম। ওপর দিকে তাকালাম।

ভালমত দেখার জন্য কপালে হাত রেখে বৃষ্টি থেকে চোখ বাঁচিয়ে মিটমিট করে তাকালাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।

একটা মুখ। বাঁয়ের বড় জানালাটায়।

সেই ছেলেটা। যাকে সেদিন এখানে আমার ঘরের দরজায় দেখেছিলাম।

আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ছেলেটা।



চার

‘অ্যাই, পা মুছে এসো! কাদা দিয়ে মেঝে নোংরা কোরো না!’ মা বলল। শূন্য লিভিং রুমের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠ।

ভিতর বারান্দায় ঢুকলাম। নতুন রঙের গন্ধ। গত বৃহস্পতিবারেই রঙ করে রেখে গেছে রঙ-মিস্ত্রি। বাড়ির ভিতরে বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় অনেক বেশি গরম।

‘অ্যাই, শোনো, রান্নাঘরের বাতিটা জ্বলছে না,’ মা’কে ডেকে বলল বাবা। ‘রঙের মিস্ত্রি কি মেইন সুইচ অফ করে রেখে গেল নাকি?’

‘আমি কী করে বলব?’ চৈঁচিয়েই জবাব দিল মা।

দুজনের কণ্ঠই জোরাল প্রতিধ্বনি তুলল মন্ত, খালি বাড়িটাতে। ‘মা, ওপরতলায় কে ঘেন আছে!’ নতুন ডোরম্যাটে পা মুছতে মুছতে চৈঁচিয়ে বললাম। লিভিং রুমে ঢোকার জন্য তাড়াহুড়ো

করছি।

জানালাৰ কাছে দাঁড়ানো মা, বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে, মুভাররা আসছে কি না দেখছে হয়তো। ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ‘কী?’

‘ওপরতলায় একটা ছেলে। জানালাৰ কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।’ দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছি।

পিছনের বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকল সুজা। বাবার সঙ্গে ছিল বোধহয় এতক্ষণ। হেসে বলল, ‘ভূতটুত হবে হয়তো। আগে থেকেই আছে?’

‘কেউ নেই ওপরতলায়,’ রুক্ষ স্বরে ধমক দিল মা। ‘তোমরা কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে?’

‘আমি আবার কী করলাম!’ সুজা বলল।

‘দেখো, রেজা, আজকে সবাই আমরা উত্তেজিত হয়ে আছি...’ মা বলতে গেল।

কিন্তু আমি বাধা দিলাম, ‘ছেলেটাকে পরিস্কার দেখেছি, মা। জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ছিল। আমার মাথায় গোলমাল নেই, তুমি জানো।’

‘কে বলল?’ ফোড়ন কাটল সুজা।

‘রেজা!’ নীচের ঠোঁট কামড়াল মা, বেশি উত্তেজিত হলে কিংবা ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে এমন করে। ‘নিশ্চয় কোন কিছুই ছায়া দেখেছ। গাছের ডাল-টাল হতে পারে।’ আবার জানালাৰ দিকে ফিরল মা। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখন। সেইসাথে প্রবল ঝোড়ো বাতাস। ঝাপটা দিচ্ছে জানালাৰ কাচের শাৰ্শিতে।

সিঁড়িৰ কাছে দৌড়ে গেলাম। ওপর দিকে তাকিয়ে চেষ্টায়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে ওখানে?’

জবাব এল না।

আরও জোরে চেষ্টালাম, ‘কে ওখানে?’

দুই হাতে কান ঢাকল মা। ‘ওহ, রেজা, প্লিজ!’

ডাইনিং রুমের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে সুজা। বাড়ির ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য।

‘কেউ আছেই ওখানে!’ বলে আর দাঁড়ালাম না। রাগ দেখিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে উঠতে শুরু করলাম।

‘রেজা!’ মা ডাকল।

কিন্তু থামলাম না। রাগ কমছে না। আমার কথা কেন বিশ্বাস করল না? কেন বলল গাছের ছায়া?

আমাকে জানতেই হবে ওপরতলায় কে আছে। মা’র কথা যে ঠিক নয়, প্রমাণ করতে হবে। বোঝাতে হবে, আমি মানুষের মুখই দেখেছি, গাছের ছায়া নয়। বুঝতে পারছি, বেশি জেদ দেখাচ্ছি। কিন্তু কী করব, একগুঁয়েমি আমাদের পরিবারের রক্তে।

পায়ের চাপে কাঁচাকোচ, মচমচ শব্দ করতে লাগল পুরানো সিঁড়ি। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছার আগে ভয় পাইনি। কিন্তু পৌঁছার পর হঠাৎ করেই খামচে ধরা অনুভূতি হলো পেটের ভিতর।

থেমে গেলাম। জোরে জোরে দম নিতে লাগলাম রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

কে হতে পারে? চোর? ডাকাত? না একঘেয়েমির শিকার কোনও ছেলে, আমাদের পড়শী, খালি বাড়িতে ঢুকে পড়েছে রোমাঞ্চের আশায়?

একা এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি আমার, বুঝতে পারলাম।

ছেলেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

‘কে ওখানে?’ আবার ডাক দিলাম। গলা কাঁপছে আমার।
স্বরও দুর্বল।

রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম।

বারান্দা ধরে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে মনে হলো।

নাকি বৃষ্টির শব্দ?

হ্যাঁ, তা-ই হবে। টালির ছাতে আছড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা।
পায়ের শব্দের মত শোনাচ্ছে।

ভয় কমে গেল আমার। রেলিঙ থেকে সরে এসে লম্বা, সরু
বারান্দায় পা রাখলাম। অন্য প্রান্তের ছোট জানালা দিয়ে ধূসর
আলো আসছে। এত সামান্য আলোয় বারন্দার অন্ধকার কাটছে
না।

কয়েক পা এগোলাম। পুরানো মেঝের তক্তা পায়ের ছাপে
মচমচ করে উঠল। ‘কে ওখানে?’ চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব নেই।

বাঁয়ের প্রথম দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ।
নতুন রঙের গন্ধ দম আটকে দিতে চায়। দরজার পাশে একটা
বাতির সুইচ। নিশ্চয় বারন্দার বাতি। সুইচ টিপলাম। আলো
জ্বলল না।

‘কেউ আছে?’ জিজ্ঞেস করলাম।

দরজার নবের দিকে হাত বাড়লাম। দেখলাম হাতটা
কাঁপছে।

নবটা ধরে আস্তে করে ঘুরিয়ে দিলাম। ভারি দম নিয়ে ঠেলা
দিলাম পাল্লায়।

দরজা খুলে উঁকি দিলাম ঘরের ভিতর। মস্ত জানালাটা দিয়ে
ধূসর আলো আসছে। ঠিক এ-সময় বিদ্যুৎ চমকাল। লাফিয়ে সরে
এলাম। প্রথমে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। তারপর দূরে সরে গেল

বজ্রের গুডুগুডু।

আস্তু, খুব সাবধানে ঘরের ভিতর পা রাখলাম। এক পা।
তারপর আরেক পা।

কাউকে চোখে পড়ল না।

ঘরটাকে গেস্টরুমের মত মনে হলো আমার। সুজা ইচ্ছে
করলে বেডরুম বানাতে পারবে এটাকে।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। আরও কালো হয়ে আসছে আকাশ।
এখন দুপুর, লাঞ্চের সময়। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখলে মনে
হয় রাত নামছে।

পিছিয়ে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। পাশের বেডরুমটাতে আমি
থাকব ঠিক করেছি। ওটাতেও একটা বড় জানালা আছে, যেটা
দিয়ে সামনের আঙিনা দেখা যায়।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোলাম। আমার ঘরের দরজার
সামনে এসে দাঁড়লাম। এটাও বন্ধ।

ভারি দম নিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। ডেকে জিজ্ঞেস
করলাম, ‘কেউ আছে ওখানে?’

কান পাতলাম।

নীরবতা।

আবার বিকট শব্দে বাজ পড়ল। আগেরবারের চেয়ে কাছে।
বরফের মত জমে গেলাম, যেন অসাড় হয়ে গেছে শরীর। বাড়ির
ভিতরের বাতাস গরম আর ভেজা ভেজা। রঙের গন্ধে মাথা ঘুরছে
আমার।

দরজার নব চেপে ধরলাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেউ
আছে ভিতরে?’

নব ঘোরাতে শুরু করেছি, এই সময় পিছন থেকে এসে আমার
কাঁধ চেপে ধরল একটা হাত।



পাঁচ

দম নিতে পারছি না। চিৎকার করতে পারছি না।

বুকের ভিতর এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে ঘুরলাম। কে ধরেছে দেখার জন্য।

‘সুজা, তুমি!’ চৈঁচিয়ে উঠলাম। ‘আর আমি ভেবেছি...ইস্, আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিলে...’

আমাকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল সুজা। হাসতে শুরু করল। পুরো বারান্দায় যেন ছড়িয়ে গেল ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের জোরাল হাসি।

এখনও বুকের কাঁপুনি থামেনি আমার। কপাল ঘামছে। ‘এত মজার কী দেখলে!’ ধাক্কা দিয়ে ওকে দেয়ালের ওপর ফেলে

দিলাম। ‘তুমি আমাকে আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিলে।’

হেসে আমার চারপাশে ঘুরতে শুরু করল ও। একেক সময় আমার ওকে মানসিক রোগী মনে হয়। আবার ওকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করলাম।

ধরতে না পেরে, রাগ করে, ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম দরজার দিকে। দেখলাম, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দরজাটা।

বিশ্বাস করতে পারছি না। দম আটকে ফেলেছি নিজের অজান্তেই। তাকিয়ে আছি হাঁ করে।

সুজাও হাসি থামিয়ে দিয়েছে। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে ওর কালো চোখ।

ঘরের ভিতর কে যেন নড়ছে মনে হলো আমার।

মনে হলো, ফিসফিস শব্দ করছে কেউ।

উত্তেজিত হাসি হাসছে।

‘কে-কে ওখানে?’ কোনমতে তুতলে বললাম। নিজের কণ্ঠস্বরটা এমন তীক্ষ্ণ আর কৰ্কশ শোনাল, নিজেই চিনতে পারলাম না।

জোরে কাঁচকোচ করে উঠল দরজার পাল্লা। আরেকটু ফাঁক হলো। তারপর বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল।

‘কে ওখানে? জবাব দিচ্ছ না কেন?’ গলা আরেকটু চড়ালাম।

আবার ভিতর থেকে উত্তেজিত ফিসফিসানি কানে এল। কেউ নড়ছে মনে হলো।

দেয়ালের কাছে পিছিয়ে গেল সুজা। পাশে হেঁটে সিঁড়ির দিকে সরতে শুরু করল। আতঙ্কে বিকৃত করে ফেলেছে চেহারাটাকে।

দরজার পাল্লাটা কাঁচকোচ করে আরেকটু বন্ধ হলো।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে সুজা। আমার দিকে তাকিয়ে

আছে। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য জোরে জোরে হাত নেড়ে ইশারা করছে আমাকে।

কিন্তু সরলাম না, বরং সামনে এগিয়ে নবটা চেপে ধরলাম। আরেক হাতে ধাক্কা দিলাম দরজার পাল্লায়।

কোন রকম বাধা এল না অন্যপাশ থেকে।

নব ছেড়ে দিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়িলাম সোজা হয়ে। চিৎকার করে বললাম, ‘কে ওখানে?’

কিন্তু শূন্য ঘর।

বাজ পড়ল।

কীসে পাল্লা নেড়েছে বুঝতে খুব একটা সময় লাগল না। উল্টো দিকের জানালার পাল্লা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। নিশ্চয় ঝোড়ো বাতাস ওখান দিয়ে এসে পাল্লায় লেগেছে। তাতে পাল্লা নড়েছে। ঘরের ভিতর যে ফিসফিসানি শুনেছি, সেটাও নিশ্চয় বাতাসের শব্দ।

কিন্তু জানালাটা খোলা রেখে গেল কে? নিশ্চয় রঙের মিস্ত্রী।

ভারি দম নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লাম। আমার ধড়াস ধড়াস করতে থাকা হৃৎপিণ্ডকে শান্ত হওয়ার সময় দিলাম।

বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। দ্রুত গিয়ে টেনে বন্ধ করে দিলাম জানালাটা।

‘রেজা, কিছু আছে ওখানে?’ বারান্দা থেকে নিচুস্বরে ডেকে জিজ্ঞেস করল সুজা।

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে ভয় দেখিয়ে আমার পিলে চমকে দিয়েছিল ও। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগটা ছাড়তে চাইলাম না। একটা শিক্ষা দিতে হবে।

জবাব দিলাম না।

ভীত পদশব্দ এগোতে শুনলাম দরজার দিকে। আবার ডেকে জিজ্ঞেস করল সুজা, ‘রেজা? রেজা? কিছু আছে ওখানে?’

পা টিপে টিপে ক্লজিটের কাছে এসে দরজাটা খুলে ফাঁক করে রাখলাম। তারপর মাথা সহ দেহের ওপরের অংশ ক্লজিটের ভিতরে ঢুকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। পায়ের দিকটা বেরিয়ে রইল ক্লজিটের বাইরে।

‘রেজা?’ প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে সুজা।

গুণ্ডিয়ে উঠলাম।

বুঝতে পারছি, এই অবস্থায় আমাকে পড়ে থাকতে দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে ওর।

‘রেজা, কী হয়েছে?’

দরজার কাছে চলে এসেছে ও। যে কোন মুহূর্তে দেখে ফেলবে আমাকে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর পড়ে আছি। মাথা দেখা যাচ্ছে না। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বজ্রপাতের বিকট শব্দ হচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর করে তুলবে ওর কাছে, সন্দেহ নেই।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, দম আটকে পড়ে রইলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, যাতে হেসে না ফেলি।

‘রেজা?’ ফিসফিস করে ডাকল ও। তারপর নিশ্চয় আমাকে চোখে পড়ল। অস্ফুট একটা ভয়াবহ শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে।

এবং তারপর দিল চিৎকার।

গলা ফাটিয়ে চৈঁচিয়ে উঠে দৌড় দিল বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। দুপদাপ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চিৎকার করে ডাকল, ‘মা! বাবা! দেখে যাও! রেজা মরে গেছে!’

আর না হেসে পারলাম না। আমি ক্লজিট থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ভেজা একটা জিভ আমার গাল চেটে দিতে লাগল।

‘কিটু!’

কুকুরটা আমার গাল চাটছে, আমার চোখের পাতা চাটছে, মরিয়া হয়ে চেটে চেটে যেন তোলার চেষ্টা করছে আমাকে। হয়তো ভেবেছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, সুস্থ করতে চাইছে। বোধহয় সান্ত্বনা দিয়ে বলতে চাইছে, ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি তো আছি।

‘আরে, অ্যাই কিটু!’ হেসে জড়িয়ে ধরলাম প্রিয় কুকুরটাকে। ‘আরে, সর সর! আঠা করে দিলি তো সমস্ত মুখ!’

কিন্তু থামল না ও। চাটতেই থাকল, আরও জোরে জোরে। ‘কিটু! কিটু! সর!’ দুই হাতে ঠেলে ওর মুখ সরানোর চেষ্টা করলাম। ‘ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মনে হচ্ছে এই নতুন জায়গাটায় আনন্দের প্রচুর খোরাক পাব আমরা।’



ছয়

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে বার বার হাসি আসতে থাকল আমার, দুপুরে সুজার ভয় পাওয়ার কথা কল্পনা করে। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যখন হাসিমুখে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম, তখনও ভয় যায়নি ওর। আমি ওকে ঠকানোতে ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

বাবা আর মা ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। কারণ মুভারদের চিন্তায় অস্থির ছিল দুজনে। মুভাররা আসতে অনেক দেরি করছিল। সুজার মুখে আমাদের ব্যাপারটা শুনে মা কিছুটা রাগের সুরেই বলেছে, ‘এ সব কোরো না তো আর। যাও, আর যেন না শুনি!’

আমি আর সুজা দুজন দুজনকে কথা দিলাম, কেউ আর কাউকে ভয় দেখাব না। তবে কতক্ষণ কথা রাখতে পারব, সন্দেহ আছে আমার।

যাই হোক, মুভাররা এসেছিল এক ঘণ্টা দেরি করে ।

বৃষ্টির বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে জানাতে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে শুরু করল ওরা । বলল, রাস্তা খারাপ থাকায় আসতে দেরি হয়েছে । আমি আর সুজা ওদের দেখিয়ে দিলাম, আমাদের দুজনের জিনিস কোন কোন ঘরে রাখতে হবে । সিঁড়ি দিয়ে তোলার সময় আমার ড্রেসারটা হাত থেকে ফেলে দিল ওরা । তবে দু'একটা আঁচড় লাগা ছাড়া আর তেমন কোনও ক্ষতি হলো না জিনিসটার ।

আমাদের আসবাবপত্রগুলো কেমন ছোট ছোট আর হাস্যকর লাগল বিশাল এই বাড়িটায় । সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করতে হলো বাবা-মাকে, আমি আর সুজা ওদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরে রইলাম, বিরক্ত করতে চাইলাম না । বাক্স থেকে মাল নামানো, সেগুলোকে গোছগাছ করা, কাপড়-চোপড় সব সাজিয়ে রাখা, ইত্যাদি, প্রচুর কাজ । তবে খাটতে পারে মা । অন্য কাজ তো করলই, এমনকী আমার ঘরের পর্দাগুলোও টানিয়ে ফেলল ।

কী একটা দিনই না গেছে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি ।

রাত প্রায় দশটা । নতুন, অপরিচিত ঘরটায় আমি ঘুমানোর চেষ্টা করছি । ঘুম আসছে না । এপাশ ওপাশ করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে চিত হলাম । কিন্তু আমার পুরানো বিছানাটায় এভাবে শুয়েও আরাম হলো না ।

সব কিছুই কেমন অন্যরকম লাগছে, কেমন গোলমেলে । আমার বিছানাটা এখন যেদিকে মুখ করে আছে, আগের বাড়ির বেডরুমে সেদিকে ছিল না । শূন্য দেয়াল । এখনও একটা পোস্টারও লাগানো হয়নি । একেবারেই খালি লাগছে মস্ত ঘরটা । ছায়াগুলো অনেক বেশি অন্ধকার ।

পিঠ চুলকাতে লাগল আমার । এক জায়গায় চুলকায়,

দু'জায়গায় চুলকায়, বাড়তে বাড়তে পুরো গা-ই চুলকাতে লাগল। বিছানাটা কি উকুনে ভর্তি? কিন্তু আমার বিছানায় তো উকুন ছিল না, ভাবতে ভাবতে উঠে বসলাম। তাকালাম বিছানাটার দিকে। আমার সেই পুরানো বিছানাটাই, ধবধবে সাদা চাদর, কোন পরিবর্তন নেই।

আবার শুয়ে পড়লাম। জোর করে চোখ বুজে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে যখন ঘুম আসে না আমার, সংখ্যা গুনি, ভাল ভাল দৃশ্য মনের পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। তাতে মাথা সাফ হয়ে গিয়ে ঘুম নেমে আসে।

এখনও সেই কৌশল কাজে লাগাতে চাইলাম। বালিশে মুখ চেপে ধরে, ৪...৬...৮...এভাবে গুনতে শুরু করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাই উঠতে লাগল। কিন্তু ঘুম এল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো বেজে বিশ।

সারারাতই জেগে থাকতে হবে, ভাবলাম। মনে হলো নতুন এই ঘরটায় কোন রাতেই ঘুমাতে পারব না।

তারপর নিজের অজান্তেই কোনও একটা সময় বোধহয় তন্দ্রা নেমে এল চোখে। কতক্ষণ ঘুমালাম, বলতে পারব না। এক ঘণ্টা হবে। বড় জোর দুই। হালকা, অস্বস্তিকর ঘুম। কিন্তু আপনাআপনি ভাঙেনি। অন্য কোন কারণে আমার ঘুমটা ভেঙেছে। চমকে উঠে বসলাম।

মোটোও ঠাণ্ডা নয় ঘরটা, বরং গরমই বলা চলে, কিন্তু আমার শীত করছে। পায়ের দিকে তাকালাম। লাখি মেরে কখন যে গা থেকে চাদর ফেলে দিয়েছি জানি না। গুড়িয়ে উঠে সামনে নুয়ে সেটা আবার গায়ে টেনে দিতে গিয়েই থেমে গেলাম।

ফিসফিসানি কানে এল।

ঘরের মধ্যে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

‘কে? কে ওখানে?’ চাঁচানোর সাহস নেই, তাই নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

ফিসফিসানি বেড়ে গেল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে অন্ধকার সয়ে এল আমার।

বিকেলবেলা আমার ঘরে যে লম্বা পর্দাগুলো লাগিয়ে দিয়ে গেছে মা, জোরাল বাতাসে সেগুলো উড়ছে।

ফিসফিসানির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ভাবলাম, বাতাসে পর্দার শব্দ হচ্ছে। ওই শব্দই বোধহয় জাগিয়ে দিয়েছে আমাকে।

বাইরে থেকে মৃদু ধূসর আলো ঢুকছে ঘরে। আমার বিছানার পায়ের কাছে ছায়া নড়ছে। পর্দার ছায়া।

লম্বা হাই তুলে বিছানা থেকে নামলাম। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। কাঠের মেঝেতে পা ফেলে জানালা বন্ধ করতে এগোলাম।

জানালায় কাছে পৌঁছতেই বন্ধ হয়ে গেল পর্দার ওড়াউড়ি, শান্ত হয়ে চুপ করে ঝুলে রইল ওগুলো। পর্দা সরিয়ে পাল্লা লাগাতে গেলাম।

আরে!

মৃদু চিৎকারটা আপনাআপনি বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। জানালা তো বন্ধ।

কিন্তু বাতাস না পেলে পর্দাগুলো উড়ছিল কীভাবে? কিছুক্ষণ ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের ধূসর রাতের দিকে। জানালা দিয়ে একটু বাতাসও আসছে না। শক্ত করে আটকানো।

পর্দা উড়তে দেখাটা কি তাহলে আমার চোখের ভুল ছিল?

হাই তুলতে তুলতে ফিরে এলাম বিছানার কাছে। অদ্ভুত ছায়া

পড়েছে বিছানায়। সেদিকে যতটা সম্ভব না তাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। চাদর টেনে দিলাম গায়ে। নিজেকে শাসন করলাম, ‘রেজা, নিজেকে সামলাও! এভাবে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই!’

কয়েক মিনিট পর আবার যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

দেখলাম, সবাই আমরা মরে গেছি। বাবা, মা, সুজা, আমি, কেউ বেঁচে নেই।

প্রথমে দেখলাম, নতুন বাড়ির ডাইনিং রুমে টেবিল ঘিরে বসেছি আমরা। ঘরের আলো এত উজ্জ্বল, এত চোখ ধাঁধানো, ভাল করে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সাদা ঝিলিমিলির মত, অস্পষ্ট।

তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সব কিছু। দেখলাম, আমাদের মুখের মাংস খসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোয়ালের কাছে এখানে ওখানে সামান্য একটু চামড়া আর দু’এক টুকরো মাংস ঝুলে আছে। যেখানে চোখ থাকার কথা, সেখানে দুটো কালো গর্ত।

চারজনেই আমরা মৃত মানুষ, নীরবে খেয়ে চলেছি। আমাদের প্লেটগুলো ছোট ছোট হাড়ের টুকরোয় ভর্তি। টেবিলের মাঝখানে মস্ত একটা প্লেটে সবজে-ধূসর হাড়ের স্তূপ উঁচু হয়ে আছে। মানুষের হাড়।

আর তারপর, এই স্বপ্নের মাঝেই, আমাদের ভয়াবহ খাবার খাওয়ায় বাধা পড়ল দরজায় থাবা দেয়ার শব্দে। ক্রমেই জোরাল হচ্ছে সেই শব্দ। নেড এসেছে, আমার প্রিয় বন্ধু। সামনের দরজায় ওকে দেখতে পাচ্ছি। দুই হাতে কিল মারছে দরজায়।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে চাইলাম। ডাইনিং টেবিল

থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে স্বাগত জানাতে চাইলাম নেডকে। ওকে সব বলতে চাইলাম, আমার কী হয়েছে—আমি যে মারা গেছি, মুখ থেকে মাংস খসে গেছে, সব।

নেডের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাগল হয়ে গেলাম।

কিন্তু চেয়ার থেকে উঠতে পারছি না। চেষ্টা করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি, কিন্তু উঠতে পারছি না।

দরজার শব্দ আরও জোরাল হলো, আরও জোরাল, কান ফেটে যাবার জোগাড়। কিন্তু আমি বসেই আছি, আমার পরিবারের বিকৃত চেহারার মানুষগুলোর সঙ্গে। ডিনার প্লেট থেকে হাড় তুলে চিবুচ্ছি।

হঠাৎ চমকে জেগে গেলাম। দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক এখনও আমার মনকে গ্রাস করে রেখেছে। দরজায় কিলের শব্দ কানে আসছে এখনও। মাথা ঝাড়া দিয়ে সরাতে চাইলাম। দূর করতে চাইলাম ভয়ানক দুঃস্বপ্নটাকে।

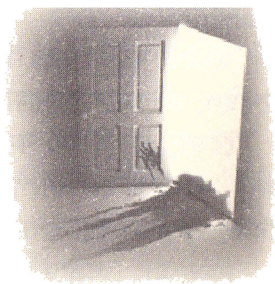
সকাল হয়ে গেছে। জানালার বাইরে নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছি।

‘আরে, এ-কী!’

পর্দা! আবার উড়তে শুরু করেছে। শব্দ করে উড়ছে। অথচ পাল্লা লাগানো।

উঠে বসে তাকিয়ে রইলাম।

এখনও লাগানোই আছে পাল্লা।



সাত

‘জানালাটা দেখব। কোথাও না কোথাও ফাঁক-ফোকর আছেই।’
নাস্তার টেবিলে বলল বাবা। বড় চামচে করে ডিম ভাজা তুলে
ঠেলে দিল মুখের ভিতর।

‘কিন্তু, বাবা, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত!’ আমি বললাম। ভয়টা
এখনও কাটেনি আমার। ‘পাগলের মত ওড়াউড়ি করছিল
পর্দাগুলো, অথচ জানালা বন্ধ!’

‘নিশ্চয় কোন জায়গার একটা কাচ খুলে পড়ে গেছে,’ বাবা
বলল।

‘বড় যন্ত্রণা দেয় রেজা!’ মায়ের ভঙ্গি নকল করে বলল সুজা।
ভাবল, মস্ত রসিকতা করে ফেলেছে।

‘এই তো, আবার গুরু কোরো না,’ মা বলল। নিজের নাস্তার
প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসল। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

ওর কালো চুল-সাধারণত আঁচড়ানোই থাকে-এখন এলোমেলো।
বাথরোবের বেস্ট ধরে টানল মা। ‘কাল রাতে দুটো ঘণ্টাও ঘুমাতে
পারিনি।’

‘আমিও না,’ জোরে নিঃশ্বাস ফেললাম। ‘আমার খালি ভয়
লাগছিল, ওই ছেলেটা আমার ঘরে ঢুকবে।’

‘রেজা, এই আজব কথাগুলো থামাও তো!’ তীক্ষ্ণ হলো মা’র
কণ্ঠ। ‘রহস্যময় ছেলে। পর্দা ওড়াউড়ি। ভয় থেকে তৈরি হয় এ-
সব অতিকল্পনা। ভয় পাওয়া বন্ধ করো।’

‘কিন্তু, মা...’ বলতে গেলাম।

‘পর্দার আড়ালে হয়তো ভূত ছিল,’ সুজা বলল। হাত উঁচু করে
‘আঁ আঁ’ করে ভূতুড়ে শব্দ করল।

‘আহ্!’ সুজার কাঁধ চেপে ধরল মা। ‘অ্যাঁ, কী বলেছিলে
তুমি? বলেছিলে না একজন আরেকজনকে ভয় দেখাবে না?’

‘আসলে এ জায়গাটাতে মানিয়ে নিতে সবারই অসুবিধে হচ্ছে
আমাদের,’ বাবা বলল। ‘রেজা, নিশ্চয় স্বপ্নে পর্দা উড়তে দেখেছ।
দুঃস্বপ্ন দেখছিলে বললে না?’

লাফ দিয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা স্মৃতির পর্দায় এসে ঢুকল আমার।
আবার যেন টেবিলে দেখতে পেলাম হাড়ভর্তি মস্ত থালা। কেঁপে
উঠলাম।

‘জায়গাটা খুব সঁতেসঁতে,’ মা বলল।

‘রোদ উঠলেই শুকিয়ে যাবে,’ বলল বাবা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আবার ধূসর হয়ে গেছে
আকাশটা। ঘন গাছপালা আমাদের পিছনের আঙিনাটাকে অন্ধকার
করে রেখেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিটু কোথায়?’

‘বাইরে,’ মুখের ডিমটুকু গিলে নিয়ে জবাব দিল মা। ‘সে-ও

খুব ভোরে উঠেছে। আমাদের মতই ঘুমাতে পারেনি বোধহয়।
অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই বাইরে বের করে দিয়েছি।’

‘আজ আমাদের কী কী কাজ, মা?’ সুজা জিজ্ঞেস করল।
প্রতিদিনই সকালে উঠে এই প্রশ্নটা করে ও। কোন কাজটা বাদ
দেয়া যায়, সেই ফন্দি আঁটে।

‘তোমার বাবা আর আমার অনেক কাজ বাকি,’ মা বলল।
‘অনেক বাক্সই এখনও খোলা হয়নি।’ পিছনের বারান্দার দিকে
তাকাল মা। অনেকগুলো বাক্স স্তুপ করে রাখা ওখানে। ‘তোমরা
আশেপাশে গিয়ে ঘুরে আসতে পারো। কী আছে, দেখে এসো।
তোমাদের বয়েসী কাউকে পেলে বন্ধুত্ব করতে পারবে।’

‘আসলে বলো, আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করতে চাইছ,’
আমি বললাম।

মা-বাবা দুজনেই হেসে উঠল। ‘তুমি খুব চালাক, রেজা।’

‘কিন্তু আমার জিনিসপত্রগুলো খোলার সময় আমি সামনে
থাকতে করতে চাই,’ গুণ্ডিয়ে উঠল সুজা। আমি জানি, মোটেও
কাজ করার জন্য নয়, স্রেফ তর্ক করার জন্য এই কথাটা বলেছে
ও।

‘যাও, কাপড় বদলাও। হেঁটে এসো,’ বাবা বলল। ‘আর
কিটুকুও নিয়ে যেয়ো, ঠিক আছে? সামনের সিঁড়ির কাছে একটা
শিকল রেখেছি।’

‘কিন্তু আমাদের সাইকেল? ওগুলো নিলে অসুবিধে কী?’ তর্ক
শুরু করল সুজা।

‘ওগুলো গ্যারেজে মালপত্রের নীচে চাপা পড়ে আছে,’ বাবা
বলল। ‘বের করতে পারবে না। তা ছাড়া চাকায় নিশ্চয় হাওয়াও
নেই।’

‘সাইকেল নিতে না পারলে আমি হাঁটতেও যাব না,’ সুজা বলল। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখল ও।

ওকে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করল বাবা আর মা। তারপর রেগে উঠল। ধমক খেয়ে অবশেষে রাজি হলো সুজা। বলল, ‘ঠিক আছে, যাচ্ছি, তবে অল্প একটু হেঁটেই চলে আসব।’

আমি নাস্তা শেষ করলাম। নেড আর ফেলে আসা অন্য বন্ধুদের কথা ভাবছি। ভাবছি, গ্রীন ভ্যালির ছেলেমেয়েরা কেমন হবে। বন্ধু পাব তো এখানে? সত্যিকারের বন্ধু?

বাবা-মা’র অনেক কাজ। ওদের কিছুটা সহযোগিতা করার জন্য এঁটো প্লেটগুলো তুলে নিয়ে এলাম বেসিনে। স্পঞ্জ দিয়ে ঘষতে লাগলাম। গরম পানি গড়িয়ে যাচ্ছে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে। আরামই লাগছে।

আমার পিছনে, বাড়ির সামনের দিকে কোথাও বাবার সঙ্গে তর্ক করছে সুজা। পানির শব্দের কারণে ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি না।

‘আছে আছে, তোমার বাস্কেটবল আছে,’ বাবা বলছে, ‘কোনও একটা বাস্কেটর ভিতরে।’ তারপর সুজা কিছু বলল। বাবা জবাব দিল, ‘এখন কী করে বলব কোনটার ভিতরে?’ আবার কিছু বলল সুজা। বাবা জবাব দিল, ‘না, এখন সময় নেই। আমি এখন পারব না। যাও।’

শেষ প্লেটটা ধুয়ে রেখে হাত মোছার জন্য একটা তোয়ালে খুঁজলাম। আশেপাশে কোথাও পেলাম না। নিশ্চয় বের করা হয়নি।

শেষে অ্যাথ্রনেই হাত মুছে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। সুজাকে ডেকে বললাম, ‘কাপড় বদলাতে পাঁচ মিনিট লাগবে আমার। তারপর বেরোব।’ এখনও বাবার সঙ্গে তর্ক করছে ও।

সামনের সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে ওপর দিকে চোখ
পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম।

ওপরে ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। আমার বয়েসীই
হবে। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। আমার দিকে তাকিয়ে
হাসছে। তাতে আন্তরিকতা নেই, উষ্ণতা নেই। আছে শীতল
এক ধরনের বুক কাঁপানো ভয়ঙ্করতা।



আট

আমার কাঁধে হাত রাখল কেউ।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িলাম।

সুজা দাঁড়িয়ে আছে। বলল, ‘বাস্কেটবলটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি হাঁটতে বেরোব না।’

‘সুজা! প্লিজ! এমন কোরো না!’ ল্যান্ডিংয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মেয়েটা নেই।

সারা গা কাঁপছে আমার। শীত লাগছে। পা এত বেশি কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তাড়াতাড়ি রেলিং ধরে ফেললাম।

‘বাবা, দেখে যাও, প্লিজ!’ চেষ্টা করে ডাকলাম।

শঙ্কিত হলো সুজা। চেষ্টা করে বাবাকে বলল, ‘আমি কিছু করিনি!’

‘না, তোমার জন্যে ডাকছি না...তুমি কিছু করনি।’ আবার ডাকলাম বাবাকে।

‘রেজা, ডাকছ কেন? আমি কাজ করছি তো।’ সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল বাবা। বাক্স খোলার পরিশ্রমে এখনই ঘামতে শুরু করেছে।

‘বাবা, কাকে যেন দেখলাম,’ আমি বললাম। ‘ওই ওখানে!’ হাত তুলে ল্যাভিঙটা দেখালাম। ‘মনে হলো, একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।’

‘রেজা, প্লিজ,’ নাকমুখ কুঁচকে ফেলল বাবা। ‘এ-সব দেখাদেখিগুলো একটু বন্ধ করো দয়া করে। এ বাড়িতে আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই...তবে কয়েকটা ইঁদুর থাকলে থাকতে পারে।’

‘ইঁদুর?’ হঠাৎ করেই আগ্রহী হয়ে উঠল সুজা। ‘কই? কোথায়?’

‘দেখগে চিলেকোঠায়...’

‘বাবা, আমি ভুল দেখিনি,’ বাধা দিয়ে বললাম। আমাকে বিশ্বাস না করায় রাগ লাগছে।

ল্যাভিঙের দিকে আঙুল তুলল বাবা। ‘কই? কী আছে? দেখো তো এখন। আমি তো কতগুলো কাপড় ছাড়া আর কিছু দেখছি না।’

আবার তাকালাম। ল্যাভিঙে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে আমার কিছু কাপড়-চোপড়। মা নিশ্চয় একটু আগে বাক্স থেকে খুলে রেখেছে ওখানে।

‘শুধুই তো কাপড়,’ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বাবা বলল। ‘কোনও মেয়েটেয়ে নেই ওখানে। কাপড়ের স্তূপকেই মেয়ে ভেবেছ।’

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল বাবা ।

‘সরি,’ আমি বললাম । সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম ।

ভয়টা যায়নি এখনও । সেজন্যই বোধহয় এমন উল্টোপাল্টা দেখছি । কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারছি না । কাপড়ের স্তূপকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ে দেখব, এতটা অতিকল্পনা কি সম্ভব?

উঁহুঁ । মনে হয় না ।

আমি পাগল নই । দৃষ্টিশক্তিও খুব ভাল ।

তাহলে? ঘটনাটা কী?

আমার ঘরের দরজা খুললাম । ছাতের আলোটা জেলে দিলাম । সামনের জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখি পর্দা উড়ছে ।

ওহু! আবার ওই দৃশ্য!

তাড়াহুড়া করে জানালার কাছে এসে দাঁড়িলাম । এবার অবশ্য পাল্লাটা খোলাই আছে । সেখান দিয়ে বাতাস আসছে ।

কে খুলল?

নিশ্চয় মা ।

ভেজা ভেজা গরম বাতাস ঢুকছে ঘরে । আকাশে ভারি মেঘ । ধূসর হয়ে আছে । যে কোন সময় নামবে ঝমঝম করে ।

বিছানার দিকে চোখ পড়তেই আরেকবার চমকে উঠলাম ।

আমার জন্য পোশাক রেখে গেছে কেউ । ফেইড জিনসের প্যান্ট আর হালকা নীল হাতাকাটা টি-শার্ট । বিছানার পায়ের কাছে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে ।

এগুলো কে রাখল? মা?

দরজার কাছে এসে চৌঁচিয়ে ডাকলাম মাকে, ‘মা! মা! আমার বিছানায় কাপড় রেখে গেছে কে?’

নীচতলা থেকে চিৎকার করে কী বলল মা, বুঝতে পারলাম না।

শান্ত হও, রেজা। শান্ত হও, নিজেকে বোঝালাম।

নিশ্চয় মা-ই রেখে গেছে। আর কে রাখবে?

আমার ক্লজিটের ভিতর থেকে ফিসফিস করে কথা বলল কেউ।

ফিরে তাকালাম। ক্লজিটের দরজা লাগানো। আবার শোনা গেল ফিসফিসানি। বিকৃত স্বরে নিচুস্বরে হাসল যেন কেউ।

নাহ্, আর পারছি না। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে স্নায়ুতে। গলা ফাটিয়ে চৈঁচিয়ে উঠলাম, ‘এই কে? কে ওখানে? কী করছ তোমরা?’

গটমট করে হেঁটে এসে দাঁড়ালাম ক্লজিটের সামনে। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুললাম।

খাবলা দিয়ে কাপড়গুলো ধরে সরিয়ে দিলাম এক পাশে। কেউ নেই।

ইঁদুর? ভাবলাম। বাবা বলেছে ইঁদুর আছে এ বাড়িতে।

‘এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,’ জোরে জোরে বললাম নিজেকে।

এই ঘরটা, মনে হচ্ছে, আমাকে পাগল বানিয়ে দেবে।

সব কিছুরই একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকে।

বিছানা থেকে প্যান্টটা তুলে নিয়ে পরতে লাগলাম। ‘যুক্তিসঙ্গত’, ‘যুক্তিসঙ্গত’ শব্দটাকে আউড়াতে থাকলাম। বার বার বলতে বলতে একটা সময় শব্দটাকে যেন আর বাস্তব মনে হলো না।

শান্ত হও, রেজা, শান্ত হও।

ভারি দম নিয়ে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনলাম।

‘আউউউউ!’ করে একটা দীর্ঘ চিৎকার শোনা গেল।

‘সুজা, শয়তানি বন্ধ করো। আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না,’
রুক্ষকণ্ঠে বললাম।

‘চলো, বেরিয়ে যাই,’ দরজার কাছ থেকে আমার দিকে
তাকিয়ে থাকতে দেখলাম সুজাকে। ‘এই জায়গাটাতে আমি
মোটোও শান্তি পাচ্ছি না।’

‘ও, তুমিও পাচ্ছ না?’ চৈচিয়ে উঠলাম। ‘তোমার সমস্যাটা
কী?’

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ও। ‘থাক, বাদ দাও।’

‘না, বলো আমাকে। কী বলতে চাচ্ছিলে?’

মেঝেতে পা ঘষল ও। ‘কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন
দেখেছি।’ জানালার পর্দার দিকে ওর নজর।

‘স্বপ্ন?’ আমার ভয়ানক দুঃস্বপ্নটার কথা ভাবলাম।

‘হ্যাঁ। আমার ঘরে দুটো ছেলে ঢুকেছিল। দুটোই ভীষণ
পাজি।’

‘ঢুকে কী করল ওরা?’ জানতে চাইলাম।

‘মনে করতে পারছি না,’ আমার চোখের দিক থেকে দৃষ্টি
সরিয়ে রেখেছে সুজা। ‘তবে খুব ভয়ের ছিল, এটুকু মনে আছে।’

‘তারপর কী হলো?’ চুল আঁচড়ানোর জন্য আয়নার দিকে
ঘুরলাম।

‘জেগে গেলাম।’ তারপর অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সুজা।
‘চলো, বেরোই।’

‘ছেলেগুলো কিছু বলেছে তোমাকে?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘নাহ্,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল সুজা। ‘শুধু হেসেছে।’

‘হেসেছে?’

‘হাসির মতই তো লাগল,’ সুজা বলল। ‘ওটা নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। তুমি কী বেরোবে, নাকি?’

‘হয়েছে, আমি রেডি।’ চিরুনি রেখে আয়নার দিকে শেষবারের মত তাকালাম। ‘চলো।’

ওর পিছন পিছন বারান্দা ধরে এগোলাম। ল্যান্ডিং পৌছে কাপড়ের স্টুপের দিকে তাকিয়ে মেয়েটার কথা ভাবলাম। ভাবলাম, প্রথম দিন যে ছেলেটাকে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখেছি, ওর কথা। সুজার স্বপ্নে দেখা ছেলে দুটোর কথাও ভাবলাম।

এতে এটাই প্রমাণ হয়, সুজা আর আমি এই নতুন জায়গাটাকে মেনে নিতে পারছি না, ভয় পাচ্ছি। মা আর বাবার কথাই হয়তো ঠিক, আমরা এখানে এসে অতিকল্পনা করছি।

হ্যাঁ, নিশ্চয় কল্পনা।

এ ছাড়া আর কী?



নয়

বাইরে বেরিয়ে, কিটুকে নিতে পিছনের আঙিনায় চলে এলাম দুজনে। আমাদের দেখে ভীষণ খুশি ও। সব সময়ই যা করে, তাই করল। কাদা লাগা পা নিয়ে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, ঘেঁউ ঘেঁউ করে চঁচানো, উন্মাদের মত আমাদেরকে ঘিরে নেচে নেচে ঘোরা, সবই করল। ওর আচরণে সামান্য হালকা হলো মন।

বাইরে আঠা আঠা গরম, অথচ আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। একটু বাতাসও নেই। ভারি, পুরানো গাছগুলো মূর্তির মত স্থির।

খোয়া বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে রাস্তার দিকে এগোলাম। মাটিতে বিছিয়ে রয়েছে বাদামী ঝরা পাতা। আমাদের জুতোর নীচে পড়ছে সেগুলো। আমাদের পাশে ঐক্যেবঁকে দৌড়ে চলেছে কিটু। কখনও আমার পাশে থেকে, কখনও সুজার পাশে থেকে, কখনও সামনে, কখনও পিছনে থেকে চলছে।

‘আমার মনে হয়,’ আমি বললাম, ‘ওর অবস্থাও আমাদের মতই। পুরানো জায়গার স্মৃতি ভুলতে পারছে না।’

মুখ বাঁকাল সুজা। মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম আমাদের বাড়িটার দিকে। দোতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলার বড় বড় জানালা দুটোকে মনে হচ্ছে বাড়িটার দুই চোখ। যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে হাসছে।

এই প্রথম লক্ষ করলাম, আমাদের পাশের বাড়িটাও আমাদের বাড়িটার সমান। তফাৎ শুধু আমাদেরটা ইটের তৈরি, ওই বাড়িটা পাথরের। লিভিং রুমের পর্দা টানা। ওপরতলার কয়েকটা জানালা বন্ধ। লম্বা লম্বা গাছ ওই বাড়িটাকেও অন্ধকার করে রেখেছে।

‘কোনদিকে যাব?’ জিজ্ঞেস করল সুজা। একটা ছোট ডালের টুকরো ছুঁড়ে দিল কিটুকে কুড়িয়ে আনার জন্য।

রাস্তার দিকে দেখালাম। ‘স্কুলটা তো ওই দিকে। চলো দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি না।’

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। পথের পাশ থেকে একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটার লাঠির মত ব্যবহার করল সুজা। ওটাতে ভর দিয়ে ওপর দিকে উঠছে ও, আর বার বার লাঠিটাকে কামড়ানোর চেষ্টা করছে কিটু।

রাস্তায় কিংবা কোন বাড়ির আঙিনায় একজন মানুষও দেখলাম না। একটা গাড়িও গেল না রাস্তা দিয়ে।

পুরো শহরটাই জনমানবহীন যখন ভাবতে আরম্ভ করেছি, ঠিক এই সময় পথের পাশের একটা নিচু পাতাবাহারের বেড়ার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একটা ছেলে।

এমনই হঠাৎ করে বেরোল, আমি আর সুজা থমকে দাঁড়ালাম।

‘হাই,’ লাজুক ভঙ্গিতে বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত

নাড়ল ও ।

‘হাই,’ একসঙ্গে জবাব দিলাম আমি আর সুজা ।

আমরা বাধা দেয়ার আগেই ছেলেটার কাছে দৌড়ে গেল কিটু, ওর জুতো গুঁকল, তারপর ঘেউ ঘেউ শুরু করল । পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলল ছেলেটা । ভীত দেখাচ্ছে ওকে ।

‘কিটু, থামো!’ চৈঁচিয়ে বললাম ।

কুকুরটাকে দুই হাতে ধরে তুলে নিল সুজা । কিন্তু গজরানো বন্ধ করল না কিটু ।

‘কামড়াবে না,’ ছেলেটাকে বললাম ।

‘না না, ঠিক আছে,’ কিটুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল ছেলেটা । শরীর মুচড়ে সুজার হাত থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিটু । ছেলেটা বলল, ‘আমার গায়ে বোধহয় কোন কিছুর গন্ধ পেয়েছে ।’

‘কিটু, থাম!’ কড়া ধমক দিলাম । কিন্তু মোচড়ানো থামাল না কুকুরটা । শেষে বললাম, ‘এমন করলে শিকল লাগিয়ে দেব কিন্তু!’

ছেলেটার দিকে তাকালাম । মাথায় ঢেউ খেলানো সোনালি চুল । ফ্যাকাশে নীল চোখ । গম্ভীর মুখে নাকটা কেমন বেমানান । গায়ে গরম কাপড়ের লম্বা হাতাওয়ালা খয়েরি লাল শার্ট, পরনে কালো জিনসের প্যান্ট । এই ভাপসা গরমে শীতকালের পোশাক পরেছে কেন ছেলেটা বুঝলাম না । নীল একটা বেজবল ক্যাপ গুঁজে রেখেছে প্যান্টের পিছনের পকেটে ।

‘আমি রেজা মুরাদ,’ পরিচয় দিলাম । ‘ও আমার ভাই সুজা ।’

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে কিটুকে মাটিতে নামিয়ে রাখল সুজা । আরেকবার ঘাউ করে উঠে ছেলেটার দিকে তাকাল কুকুরটা, মৃদুস্বরে গোঙাল, তারপর রাস্তার পাশে বসে গা চুলকাতে লাগল ।

‘আমি হ্যারি ব্যানার,’ জিনসের পকেটে দুই হাত ঢোকাল ছেলেটা। কুকুরটা চিৎকার বন্ধ করাতে একটু যেন ভয় কমেছে ওর, যদিও সতর্ক চোখে এখনও তাকাচ্ছে কিটুর দিকে।

হঠাৎ করেই লক্ষ করলাম আমি, পরিচিত লাগছে হ্যারিকে। আগে কোথাও দেখেছি ওকে। কোথায়? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, যতক্ষণ না চিনতে পারলাম।

আচমকা ভয় যেন চেপে ধরল আমাকে। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

এই ছেলেটাকেই আমার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ঘরের জানালায়।

‘তুমি,’ রুক্ষকণ্ঠে বললাম, ‘তুমি আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিলে!’

দ্বিধান্বিত মনে হলো ছেলেটাকে, ‘কোথায়?’

‘আমাদের বাড়িতে। আমার ঘরে। ঠিক?’

হেসে উঠল ও।

হ্যারির দিকে মাথা তুলে চাপাস্বরে গর্জন করল কিটু। তারপর আবার চুলকানোয় মনোযোগ দিল।

‘মনে হচ্ছে আমি তোমাকে দেখেছি!’ নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে আমার।

‘বহুকাল আমি তোমাদের বাড়িতে যাইনি,’ সতর্ক চোখে কিটুর দিকে তাকাল আবার হ্যারি।

‘বহুকাল?’

‘হ্যাঁ। ওই বাড়িটাতেই থাকতাম আমি।’

‘তাই?’ আমি আর সুজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ছেলেটার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। ‘হ্যাঁ। প্রথম এসে ওখানেই উঠেছিলাম আমরা।’ ছোট একটা চ্যাপ্টা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল ও।

গরগর করে উঠল কিটু। পাথরটা কুড়িয়ে আনতে ছুটল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ দোলাচ্ছে ওর খাটো লেজটা।

ভারি মেঘের স্তর নেমে এসেছে আকাশের অনেক নীচে। কালো হচ্ছে ক্রমশ। ‘এখন কোথায় থাকো?’ ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আরেকটা পাথর ছুঁড়ে দিয়ে রাস্তার দিকে দেখাল ও।

‘আমাদের বাড়িটা কি তোমার পছন্দ?’ সুজা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ,’ হ্যারি জবাব দিল, ‘খুব ভাল বাড়ি। প্রচুর ছায়া আছে।’

‘ওই বাড়ি তোমার পছন্দ?’ চেষ্টা করে উঠল সুজা। ‘এত পুরানো, অন্ধকার...’

বাধা দিল কিটু। আবার একবার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে ইচ্ছে করল যেন। দৌড়ে গিয়ে হ্যারির কয়েক ইঞ্চি দূরে থামল, তারপর পিছিয়ে আসতে শুরু করল। হ্যারিও সাবধানে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

পকেট থেকে শিকল বের করল সুজা। ‘নাহ্, আর তোকে না বেঁধে পারলাম না।’ গজরাতে থাকা কুকুরটাকে শক্ত করে ধরে রাখলাম আমি, গলার কলারে শিকল আটকে দিল সুজা।

‘সত্যি বলছি, আগে কখনও এ রকম করেনি ও,’ কৈফিয়তের ভঙ্গিতে হ্যারিকে বললাম।

শিকল লাগিয়ে দেয়াতে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কিটু। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দিয়ে সুজাকে টেনে নিয়ে চলল রাস্তা ধরে। তবে শেষ পর্যন্ত চিৎকার বন্ধ করল ও।

‘কিছু একটা করা দরকার,’ সুজা বলল।

‘কী করব?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারি। কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বাঁধায় স্বস্তি বোধ করছে।

কী করা যায় ভাবলাম আমি আর সুজা।

‘তোমাদের বাড়িতে চলো,’ সুজা বলল।

মাথা নাড়ল হ্যারি। ‘নাহ্। এখন যাব না।’

‘গেছে কোথায় সবাই?’ নির্জন রাস্তাটার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় নজর বোলালাম আমি। ‘একেবারেই তো মৃত শহর মনে হচ্ছে।’

হাসল হ্যারি। ‘হ্যাঁ। মৃতই। ভুল বলনি। স্কুলের পিছনে খেলার জায়গা আছে, প্লেগ্ৰাউন্ড। যাবে ওখানে?’

‘যাব,’ রাজি হয়ে গেলাম।

আগে আগে চলল হ্যারি। ওর কয়েক ফুট পিছনে আমি। সবার পিছনে থেকে এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে কুকুরের শিকল ধরে এগোল সুজা। বড় যত্নশীল করছে কুকুরটা। একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে, বিরক্ত করে মারছে সুজাকে।

মোড় ঘোরার আগে ছেলেমেয়েগুলোকে চোখে পড়েনি আমাদের।

দশ-বারোজন হবে ওরা, বেশির ভাগই ছেলে, মেয়ে কম। হাসাহাসি, চেষ্টামেচি করছে। খেলার ছলে একে অন্যকে ধাক্কা দিচ্ছে।

রাস্তার মোড় ঘুরে এগিয়ে এল ওরা। ওদের কেউ কেউ আমার বয়েসী, বাকিদের বয়েস বেশি। ওদের পরনে জিনস, গায়ে গাঢ় রঙের টি-শার্ট। একটা মেয়েকে ঝট করে চোখে পড়ে, কারণ ওর মাথাভর্তি লম্বা সোনালি চুল, পরনে সবুজ পোশাক।

‘আরে, দেখো!’ চকচকে কালো চুলওয়ালা লম্বা একটা ছেলে আমাদের দেখিয়ে বলল।

হারির সঙ্গে আমাদের দেখে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ওরা, কিন্তু এগোনো বন্ধ করল না। কেউ কেউ অকারণেই হাসছে, কিংবা কোনও হাসির কারণ ঘটেছিল, সেটা মনে পড়ায় হাসছে।

আমরা থেমে গেলাম। তাকিয়ে আছি ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ‘হাই’ বলার অপেক্ষায়। কিছু যেন পাগল হয়ে গেছে, ক্রমাগত শিকলে টান দিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

‘হাই,’ কালো চুলওয়ালা লম্বা ছেলেটা হেসে বলল আমাদের। কোনও দুর্বোধ্য কারণে এই কথাটা যেন খুব মজার মনে হলো বাকি ছেলেমেয়েগুলোর কাছে। হেসে উঠল ওরা। সবুজ পোশাক পরা মেয়েটা, খাটো, লাল চুলওয়ালা একটা ছেলেকে এমন জোরে ধাক্কা মারল, আরেকটু হলেই আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত ছেলেটা।

‘কেমন চলছে, হ্যারি?’ খাটো করে ছাঁটা কালো চুলওয়ালা একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল। মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগল। কোথায় যেন দেখেছি।

‘খারাপ না,’ জবাব দিল হ্যারি। আমার আর সুজার দিকে ফিরে বলল, ‘এরা সবাই আমার বন্ধু। এখানে আশেপাশেই থাকে।’

‘হাই,’ অস্বস্তি বোধ করছি আমি। ওই কিছুটা এত শিকল টানাটানি আর ঘেউ ঘেউ করে অস্বস্তিটা আরও বাড়াচ্ছে। ওকে আটকে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারী সুজা।

‘ওর নাম টমাস হার্ডি,’ লাল চুলওয়ালা খাটো ছেলেটাকে

দেখাল হ্যারি। মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। ‘আর ও জিম বাটলার, ও এরিকা গারনার, ও টনি এরিকসন...’ একে একে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে দেখিয়ে নাম বলল ও। প্রতিটি নাম মনে রাখার চেষ্টা করলাম, যদিও সেটা অসম্ভব।’

‘খীন ভ্যালি কেমন লাগছে তোমাদের?’ একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘এখনও বুঝতে পারছি না,’ জবাব দিলাম। ‘তবে ভাল লাগানোর চেষ্টা করছি। এখানে আজ আমাদের প্রথম দিন।’

হেসে উঠল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। আমার কথায় মজাটা কোথায়, বুঝলাম না। নাকি অকারণেই হাঁদার মত হাসে ওরা?

‘কী জাতের কুকুর ওটা?’ সুজাকে জিজ্ঞেস করল টমাস হার্ডি।

কিটুর শিকলটা ধরে রেখে জবাব দিল সুজা, ‘টেরিয়ার।’

কঠিন দৃষ্টিতে কিটুর দিকে তাকিয়ে আছে টমাস। বুঝলাম, কুকুরটাকে পছন্দ করতে পারছে না।

এরিকা গারনার যে মেয়েটার নাম, ওর মাথাভর্তি সোনালি চুল। লম্বা শরীর। খুব সুন্দরী। এগিয়ে এল আমার দিকে। মোলায়েম স্বরে বলল, ‘আগে আমি তোমাদের বাড়িটাতেই থাকতাম?’

‘কী?’ ভুল শুনলাম নাকি!

‘চলো, প্লেথ্রাউন্ডে যাই,’ বাধা দিয়ে হ্যারি বলল।

হ্যারির কথায় কান দিল না কেউ।

চুপ হয়ে গেল সবাই। এমনকী কিটুও চিৎকার থামিয়ে দিয়েছে।

আমাদের বাড়িটায় থাকত-এরিকা কি সত্যি বলছে? না রসিকতা করছে আমার সঙ্গে?

আমি কোন প্রশ্ন করার আগেই আবার দলের কাছে ফিরে গেল
এরিকা।

চক্র! হ্যাঁ, চক্র! আমাদের তিনজনকে ঘিরে গোল চক্র তৈরি
করেছে ছেলেমেয়ের দল। ব্যাপারটা ভাল লাগল না আমার।

আচমকা ভয় যেন খামচে ধরল আমাকে। মনে হচ্ছে অদ্ভুত
কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মারাত্মক কিছু। এটাও কি আমার অতিকল্পনা?

হঠাৎ করেই সবাইকে কেমন অন্য রকম মনে হলো আমার।
কেমন যেন বদলে গেছে হাবভাব।

বিপদের আশঙ্কা করছি।

দুটো ছেলের হাতে বেজবল ব্যাট। সবুজ পোশাক পরা
মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত
দেখে কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে।

একটা কথাও বলছে না কেউ। পুরো রাস্তাটা নির্জন। কোথাও
কোন শব্দ নেই, কেবল কিটুর মোলায়েম গোঙানি ছাড়া।

ভয় পেলাম।

এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন সবাই?

নাকি আবার সেই অতিকল্পনা শুরু করেছি?

হারির দিকে তাকালাম। এখনও আমার পিছনেই রয়েছে ও।
ওর মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর নেই। তবে আমার চোখের দিকে
তাকাচ্ছে না।

‘অ্যাঁই, শোনো,’ আমি বললাম, ‘কী হচ্ছে এ-সব?’ কণ্ঠস্বর
স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না, কেঁপে উঠল গলাটা।

সুজার দিকে ফিরলাম। ও কিটুকে সামলাতেই ব্যস্ত। কী
ঘটছে এখানে, খেয়ালই করছে না।

আমাদের আরেকটু কাছে এসে ব্যাট উঁচু করল ছেলে দুটো।

আমাদেরকে ঘিরে রাখা ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকালাম ।
ভয় যেন গলা টিপে ধরেছে আমার ।
ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে চক্রটা । আমাদের কিছু একটা
করবে ছেলেমেয়েগুলো । ওদের উদ্দেশ্য ভাল নয় ।



দশ

মাথার ওপরের কালো মেঘ আরও নীচে নামল। বাতাস ভেজা ভেজা, ভারি।

এখনও কিটুকে নিয়েই ব্যস্ত সুজা। কী ঘটছে দেখছে না। হ্যারি কিছু বলবে কি না, ছেলেমেয়েগুলোকে থামানোর চেষ্টা করবে কি না বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছু করল না ও। নির্বিকার চেহারা করে রেখে চুপচাপ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন পাথর হয়ে গেছে ও।

আরও ছোট হলো চক্রটা। আমাদের আরও কাছে চলে এল ছেলেমেয়েগুলো।

দম আটকে ফেলেছিলাম। লম্বা দম নিয়ে মুখ ফাঁক করলাম চিৎকার করার জন্য।

‘অ্যাই, কী করছ তোমরা?’ চক্রের বাইরে থেকে শোনা গেল একজন বড় মানুষের কণ্ঠ ।

সবাই ফিরে তাকালাম । লম্বা লম্বা পা ফেলে মিস্টার জোনসকে দ্রুত এগোতে দেখলাম । তাঁর রেলজারের বোতামগুলো খোলা । বাতাসে কানা দুটো বাড়ি খাচ্ছে গায়ের সঙ্গে । মুখে আন্তরিক হাসি । ‘অ্যাই, কী হয়েছে তোমাদের?’

আমার আর সুজার ওপর যে চড়াও হচ্ছিল ছেলেমেয়ের দল, মনে হয় বুঝতে পারেননি তিনি । তাহলে নিশ্চয় হাসি থাকত না মুখে ।

‘প্লেথ্যাউন্ডের দিকে যাচ্ছিলাম আমরা,’ হাতের ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিল টমাস হার্ডি । ‘সফটবল খেলতে ।’

‘ভাল, খেলাধুলার মধ্যে থাকা ভাল,’ মিস্টার জোনস বললেন । কাঁধের ওপর বাড়ি খাচ্ছে টাইটা, টেনে জায়গামত নামালেন সেটা । মুখ তুলে তাকালেন কালো আকাশের দিকে । ‘বৃষ্টি তো এসে গেল, দেখো খেলতে পারো কি না ।’

চক্র ভেঙে পিছিয়ে গেল কয়েকটা ছেলেমেয়ে ।

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে দিয়ে রেজা-সুজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন মিস্টার জোনস । ‘আরে! তোমরা! খেয়ালই করিনি ।’

‘গুড মর্নিং,’ বিড়বিড় করে বললাম । পুরো দ্বিধায় পড়ে গেছি ।

সবাই হাসছে । হই-চই করছে । একটু আগে এরাই আমাদের ওপর চড়াও হয়ে মারতে আসছিল, এটাও কি আমার কল্পনা? সুজা আর হ্যারি অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি । আবার কি মাথা গরম হয়ে যাওয়াতে উল্টোপাল্টা দেখেছি?

মিস্টার জোনস সময়মত না এলে কী ঘটত? ব্যাট দিয়ে আমাদের মাথায় বাড়ি মারত ছেলে দুটো?

‘নতুন বাড়িতে কেমন লাগছে তোমাদের?’ ঢেউ খেলানো চুল হাত দিয়ে সমান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জোনস।

‘ভাল,’ একসঙ্গে জবাব দিলাম আমি আর সুজা। মিস্টার জোনসের দিকে তাকিয়ে আবার শিকল টানাটানি আর ঘেউ ঘেউ শুরু করল কিটু।

মুখ কালো করে ফেললেন মিস্টার জোনস। কুকুরটার এই ব্যবহার ভাল লাগল না তাঁর। ‘তোমাদের কুকুরটা এখনও দেখতে পারে না আমাকে।’ কিটুর ওপর ঝুঁকে বললেন, ‘অ্যাঁই কুকুর, শান্ত হও। এমন করছ কেন?’

রাগে আরও জোরে চেষ্টা করে উঠল কিটু।

‘আজ কী যেন হয়েছে ওর,’ কৈফিয়তের সুরে মিস্টার জোনসকে বললাম। ‘কাউকেই পছন্দ করতে পারছে না।’

সোজা হলেন মিস্টার জোনস। ‘হুঁ! কুকুররা এমনই!’ তাঁর কথাটা কেমন রহস্যময় শোনাল আমার কাছে।

গাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি। কয়েক গজ দূরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম গাড়িটা। ‘তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি,’ ফিরে তাকিয়ে সুজা আর আমাকে বললেন তিনি। ‘দেখি, কোন কিছুর প্রয়োজন হয় কি না তোমার বাবা-মা’র। অ্যাঁই, ছেলেমেয়েরা, খেলো তোমরা! শুধু খেলো। আর কিছু কোনো না কিন্তু।’ অস্পষ্ট একটা শাসানির সুর আছে মনে হলো তার কণ্ঠে।

গাড়িতে উঠে চলে যেতে দেখলাম তাঁকে।

‘খুব ভাল লোক,’ হ্যারি বলল।

‘হ্যাঁ,’ একমত হলাম। অস্বস্তিটা ফিরে এল আবার। মিস্টার জোনস চলে গেছেন, জানি না, ছেলেমেয়েগুলো এখন কী করবে।

আমাদের ঘিরে আবার কি সেই ভয়ঙ্কর চক্র রচনা করবে?

না। সবাই হাঁটতে শুরু করেছে। ব্লকের অন্যপাশে, স্কুলের

পিছনের প্লেগ্‌হাউন্ডের দিকে। আবার কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। আমাকে আর সুজাকে যেন বেমালুম ভুলে গেছে।

ভাবতে ভাবতে চলেছি, আমাকে আর সুজাকে কিছু করতে চায়নি ওরা। পুরো ব্যাপারটাই আমার কল্পনা।

নিশ্চয় তাই।

ভাগ্যিস চেষ্টায়ে উঠিনি! কিংবা এমন কিছু করিনি! তাহলে স্রেফ গাধা ভাবত আমাকে।

শূন্য প্লেগ্‌হাউন্ড। মনে হয় আকাশ মেঘলা থাকাতে যখন-তখন বৃষ্টি নামার ভয়ে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই ঘর থেকে বেরোয়নি।

ঘাসে ঢাকা একটা বড় মাঠকে প্লেগ্‌হাউন্ড বানানো হয়েছে। চারপাশে টিনের উঁচু শক্ত বেড়া। দোলনা, স্লাইড-ছোটদের খেলার জন্য এ রকম নানা জিনিস রয়েছে ওখানে। এক প্রান্তে বেজবল খেলার জায়গা। এক সারি টেনিস কোর্ট দেখলাম। সব খালি। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই।

বেড়ার একটা খুঁটির সঙ্গে কিটুকে বাঁধল সুজা। তারপর দৌড়ে এল আমাদের কাছে। জিম বাটলার নামের ছেলেটা দল ভাগ করে দিল। হ্যারি আর আমি একদলে পড়লাম। সুজা অন্য দলে।

মাঠে খেলতে নামলাম। উত্তেজিত হয়ে আছি। সফটবল খুব একটা খেলতে পারি না আমি। নতুন জায়গায় নতুন খেলোয়াড়দের সামনে তাই অস্বস্তি বোধ করছি।

মেঘ সরে যেতে লাগল। কিছুটা উজ্জ্বল হলো আকাশ। দুটো পুরো ইনিংস খেললাম আমরা। প্রতিপক্ষ জিতছে। তবে মজা পাচ্ছি আমি।

গুরুতে যাদের নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম, তাদেরকে আর খারাপ মনে হচ্ছে না এখন। এরিকা গারনার মেয়েটা তো রীতিমত ভাল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। হাসিটাও চমৎকার,

যদিও প্রতিটি দাঁতে ব্রেস পরানো। দেখলাম, আমার সঙ্গে খাতির করার জন্য অস্থির হয়ে আছে ও।

মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিল। তৃতীয় ইনিংস শুরু হয়েছে। হঠাৎ হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখি একটা রূপার হুইসেল বাজাচ্ছে জিম বাটলার।

সবাই দৌড়ে গেলাম ওর কাছে। ‘আর বোধহয় না খেলাই ভাল আমাদের,’ উজ্জ্বল হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকাল ও। ‘বাড়িতে বলে এসেছি, লাঞ্চার আগেই ফিরব।’

ঘড়ির দিকে তাকলাম। মাত্র সাড়ে এগারোটা। এখনও সকাল।

কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না। অবাক হলাম।

সবাই সবার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, দৌড়াতে শুরু করল। এত দ্রুত, যেন এখান থেকে পালানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

অন্যদের মতই আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল এরিকা। মুখ-চোখ গম্ভীর। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, রেজা। মনে হচ্ছে ভালই কাটবে আমাদের।’

‘হ্যাঁ, কাটবে,’ আমি জবাব দিলাম। ‘তুমি জানো, কোন বাড়িটায় উঠেছি আমরা?’

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল ও, ‘হ্যাঁ। জানি। একসময় আমিও ওই বাড়িতেই থাকতাম।’

ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতর। আবার কি ভুল শুনলাম?



এগারো

ধীরে ধীরে কেটে গেল কয়েকটা দিন। আমাদের নতুন বাড়িতে, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আমি আর সুজা।

প্লেগাউন্ডে যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের, ওরা কেউ এখনও বন্ধু হয়নি আমাদের। আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ওরা, দলে খেলতে নেয়। ওদের কারও ব্যাপারেই কিছু জানি না আমরা। ওদের মুখ থেকে কথা বের করা খুব কঠিন।

রাতে আমার ঘরে প্রতিদিনই ফিসফিসানি, মৃদু হাসির শব্দ শুনি। উপেক্ষা করতে না পেরে কানে বালিশ চাপা দিয়ে পড়ে থাকি। একরাতে মনে হলো, সাদা কাপড় পরা একটা মেয়েকে দেখলাম, দোতলার বারান্দার শেষ মাথায়। কিন্তু যখনই ভাল করে দেখতে গেলাম, দেয়াল ঘেঁষে কিছু ময়লা সাদা চাদর পড়ে থাকতে

দেখলাম।

আমি আর সুজা মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিটু একেবারেই পারছে না। অদ্ভুত আচরণ করে। প্রতিদিন ওকে আমাদের সঙ্গে প্লেগ্‌হাউন্ডে নিয়ে যাই, কিন্তু এখনও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। ভয়ঙ্কর খেপা হয়ে ওঠে ও। ছেলেমেয়েদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ শুরু করে, কামড়ে দিতে যায়।

‘নতুন জায়গায় এখনও অস্বস্তি বোধ করে,’ সুজাকে বোঝাই। ‘ঠিক হয়ে যাবে।’

কিন্তু কিটু আর ঠিক হয় না। দুই হপ্তা বাদে আমরা হ্যারি, এরিকা, জিম, টমাসের সঙ্গে সফটবল খেলছি, হঠাৎ বেড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি কিটু নেই।

কোনভাবে শিকল খুলে পালিয়েছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিটুকে খুঁজে বেড়ালাম আমি আর সুজা। ব্লক থেকে ব্লকে, প্রতিটি বাড়ির সামনের উঠানে, পিছনের আঙিনায়, পতিত জায়গায়, বনের ভিতরে। তারপর হঠাৎ করেই এক সময় লক্ষ করলাম, অচেনা জায়গায় চলে এসেছি।

গ্রীন ভ্যালির রাস্তাগুলো সেই আগের মতই লাগছে। রাস্তার পাশে ইট, পাথর, কিংবা টালির তৈরি বাড়িঘর, পুরানো গাছপালায় ঘেরা, অন্ধকার।

‘বিশ্বাস করতে পারছি না, হারিয়ে গেছি আমরা,’ সুজা বলল। একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন দম নিচ্ছে।

‘ওই বোকা কুকুরটা,’ শূন্য রাস্তায় খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার চোখ, ‘এভাবে পালাল কেন? আগে তো কখনও পালায়নি।’

‘শিকল খুলল কীভাবে, তা-ই তো বুঝতে পারছি না,’ মাথা নেড়ে বলল সুজা। শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ‘শক্ত

করে বেঁধেছিলাম, মনে আছে আমার।’

‘আচ্ছা, বাড়ি চলে যায়নি তো?’ ভাবনাটা পুলকিত করে তুলল আমাকে।

‘হ্যাঁ!’ গাছের কাছ থেকে সরে এসে আমার কাছে দাঁড়াল সুজা। ‘ঠিক বলেছ। বহু আগেই বাড়ি গিয়ে বসে আছে। আর আমরা বোকার মত ওকে এখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আগে বাড়িতে দেখা উচিত ছিল। চলো, চলো!’

‘চলো,’ যে জায়গাটায় রয়েছি আমরা, সেটার চারপাশে তাকалам। ‘কিন্তু বাড়ি কোনদিকে সেটা তো আগে বুঝতে হবে।’

রাস্তার এ মাথা ওমাথা দেখলাম। কোনদিক থেকে এসেছি আমরা, প্লেগাউন্ড আর স্কুলটা কোনদিকে, শেষ কোন মোড়টা ঘুরেছি, বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে করতে না পেরে একদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

ভাগ্য ভাল, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলটা চোখে পড়ল। প্লেগাউন্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেড়ার খুঁটির দিকে তাকалам, যেখানে কিটু বাঁধা ছিল। হতচ্ছাড়া, ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ কুকুরটা! গ্রীন ভ্যালিতে আসার পর থেকেই এমন অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা শুরু করেছে!

বাড়ি গিয়ে দেখব তো ওকে? হঠাৎ সন্দেহ জাগল।

কয়েক মিনিট পর, আমি আর সুজা, আমাদের বাড়ির খোয়া বিছানো ড্রাইভওয়েতে ঢুকে, কিটুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটলাম। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সামনের দরজা। মা বেরিয়ে এল। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পরনের জিনসের প্যান্টে ধুলো-ময়লা লেগে আছে। মা আর বাবা মিলে পিছনের বারান্দাটা রঙ করেছে। ‘কোথায় ছিলে তোমরা?’ মা জিজ্ঞেস করল। ‘দুই ঘণ্টা

আগেই লাঞ্ছের সময় পেরিয়ে গেছে।’

‘মা, কিটু বাড়ি ফিরেছে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এতক্ষণ!’ সুজা বলল।

‘এসেছে নাকি?’ আবার জিজ্ঞেস করলাম।

ভুরু কুঁচকে গেল মা’র। ‘আমি তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গেই আছে।’

দমে গেলাম। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাতায় ছাওয়া খোয়া বিছানো পথের ওপরই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সুজা।

‘ওকে দেখনি?’ গলা কাঁপছে আমার। প্রচণ্ড হতাশা চাপা দিতে পারছি না। ‘আমাদের সঙ্গেই ছিল। তারপর দেখি পালিয়েছে।’

‘তাই নাকি?’ সুজাকে ড্রাইভওয়ে থেকে উঠতে ইশারা করল মা। ‘পালিয়েছে? শিকলে বেঁধে রাখনি?’

‘ওকে খুঁজে বের করতে হবে, মা,’ মাটিতে শুয়ে থেকেই সুজা বলল। ‘তোমার সাহায্য লাগবে। গাড়ি বের করো। ওকে খুঁজতে যেতে হবে, এখনি।’

‘বেশিদূর যায়নি,’ মা বলল। ‘খেয়ে নাও। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে? খাও, তারপর...’

‘না, এখনি!’ চেষ্টা করে উঠল সুজা।

‘কী হয়েছে?’ বাবা উঁকি দিল। চুলে সাদা রঙ লেগে আছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে মা’র পাশে দাঁড়াল। ‘সুজা, চেষ্টাচ্ছ কেন?’

কী হয়েছে বাবাকে বললাম। শুনে বলল, এখন ব্যস্ত। কিটুকে খুঁজতে যেতে পারবে না। মা বলল, যাবে, তবে আগে আমাদের খেয়ে নিতে হবে। দুই হাত ধরে সুজাকে উঁচু করলাম, তারপর প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলাম ঘরের ভিতর।

হাতমুখ ধুয়ে, তাড়াহুড়া করে পিনাট বাটার আর জেলি দিয়ে

তৈরি স্যান্ডউইচ গিলে নিলাম দুজনে। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল মা। তাতে চড়ে আমাদের হারানো কুকুরটাকে খুঁজতে বেরোলাম।

কিন্তু পেলাম না ওকে।

কোন চিহ্নই নেই।

সুজা আর আমার মন এত খারাপ হয়ে গেল, কোনমতে কান্না ঠেকালাম। বাবা আমাদের সান্ত্বনা দিল, কিটু বাড়ি চেনে। যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হলো না।

কোথায় গেল ও?

নীরবে ডিনার খেলাম চারজনে। আমার জীবনের ভয়ঙ্করতম সন্ধ্যা ওটা।

‘খুব শক্ত করেই বেঁধেছিলাম,’ সুজা বলল। চোখে পানি টলমল করছে। খাবারের প্লেটে ওর খাবারগুলো পড়ে আছে।

‘ছুটে যাওয়ার ওস্তাদ কুকুররা,’ বাবা বলল। ‘চিন্তা কোরো না। ও চলে আসবে।’

‘যা রাত,’ বিষণ্ণ কণ্ঠে মা বলল। ‘এমন রাতে পার্টি!’

আমার মনে পড়ল, মা আর বাবা বেরিয়ে যাবে। পাশের ব্লকের একজন প্রতিবেশী ওদেরকে পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছে।

‘আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না,’ বাবা বলল। ‘সারাটা দিন যা পরিশ্রম গেছে, গুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে এখন। কিন্তু না গেলেও হবে না, ওরা মাইন্ড করবে। তোমরা থাকতে পারবে তো?’

‘পারব,’ আমি বললাম। মন জুড়ে রয়েছে কিটুর ভাবনা। কান পেতে রেখেছি। যে কোন মুহূর্তে দরজায় কুকুরটার ডাক শোনার

আশায়।

কিন্তু শুনলাম না। গড়িয়ে চলল ঘণ্টাগুলো। শোয়ার সময় হলো। তবু এল না কিটু।

চুপচাপ ওপরতলায় উঠে এলাম আমি আর সুজা। খুব ক্লান্ত লাগছে। সারা দিন কিটুকে খুঁজে বেড়ানোর পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায়। কিন্তু জানি, বিছানায় শুয়ে ঘুম আসবে না।

আমার বেডরুমের বাইরের বারান্দা দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িলাম। ভিতরে শুরু হলো সেই প্রতিদিনকার ফিসফিসানি। পায়ের শব্দ শুনলাম। হেঁটে বেড়াচ্ছে কেউ। তবে এ-সব এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমি আর ভয়ও পাই না, চমকেও যাই না।

কোনরকম দ্বিধা না করে ঘরের ভিতর পা রাখলাম। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। শূন্য ঘর। জানতাম, এমনই দেখব। রহস্যময় শব্দ উধাও হয়েছে। পর্দার দিকে তাকালাম। স্থির হয়ে বুলছে।

তারপর দেখলাম, বিছানায় আমার কাপড়-চোপড় ছড়ানো ছিটানো।

কয়েক জোড়া জিনস। কয়েকটা টি-শার্ট। একজোড়া গরম কাপড়ের শার্ট। একটা স্কার্ট।

অদ্ভুত ব্যাপার তো, ভাবলাম। মা অনেক গোছানো স্বভাবের, গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে রীতিমত তার বাতিক আছে। কাপড়গুলো মা ধুয়ে থাকলে এভাবে বিছানার ওপর ছড়িয়ে ফেলে যেত না। ড্রেসারের ড্রয়ারে রেখে যেত।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর কাপড়গুলো তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখতে শুরু করলাম। মনে হলো, অতিরিক্ত কাজের চাপে মা'র এই অবস্থা হয়েছে। কাপড়গুলো ধুয়েছে ঠিকই, কিন্তু

আমার জন্য ফেলে রেখে গেছে যাতে গুছিয়ে রাখি। কিংবা রেখে অন্য কাজ করতে গেছে, পরে এসে গোছাবে ভেবে।

আধ ঘণ্টা পর বিছানায় শুলাম। চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। ছাতের ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। ক'টা বাজল, তা-ও জানি না। জেগেই আছি আমি। কিটুর কথা ভাবছি। নতুন ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবছি। ভাবছি আমার প্রতিবেশীদের কথা। এই সময় কাঁচাকোঁচ করে খুলে গেল আমার ঘরের দরজা।

কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ।

লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। অন্ধকারে কেউ আমার ঘরে ঢুকছে।

‘ভাইয়া, আমি!’ ফিসফিস করে বলল একটা কণ্ঠ।

এতই উত্তেজিত হয়ে আছি, সুজার কণ্ঠটা চিনতেও কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল। ‘সুজা! কী চাও? এখানে কী?’

চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল চোখে। ঝট করে আমার হাত উঠে গেল চোখের কাছে।

‘সরি!’ তাড়াতাড়ি টর্চ ঘোরাল সুজা। ‘তোমার চোখে পড়বে বুঝতে পারিনি...’

‘এত আলো!’ আমি বললাম। ‘এত উজ্জ্বল!’

ছাতের দিকে টর্চ ঘোরাল সুজা। শক্তিশালী সাদা আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছাতটা। প্রায় রোদের আলোর মত।

মাথা ঝাঁকিয়ে সুজা বলল, ‘হ্যাঁ, উজ্জ্বলই। এটা হ্যালোজেন লাইট।’

‘তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখানে কী?’ অধৈর্যকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। এখনও ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না আমি। দুই হাতে চোখ ডললাম।

‘কিটু কোথায় গেছে আমি জানি,’ ফিসফিস করে বলল সুজা।
‘ওকে আনতে যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’

‘মানে?’ ঘড়ির দিকে তাকালাম। বারোটোর বেশি। ‘এখন তো রাত দুপুর!’

‘বেশিক্ষণ লাগবে না।’

আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমার চোখ। দেখতে পাচ্ছি। সুজার দিকে তাকালাম। হ্যালোজেন লাইটের আভা পড়েছে ওর গায়ে। কাপড় পরে তৈরি হয়েই এসেছে ও। জিনস, আর পুরো হাতাওয়ালা টি-শার্ট।

‘আমি বুঝতে পারছি না, সুজা,’ ঘুরে বসে মাটিতে পানামালাম। ‘সবখানে খুঁজেছি আমরা। কোথায় যেতে পারে কিটু?’

‘গোরস্থানে,’ সুজা জবাব দিল।

‘মানে?’ বুঝলাম বড় বড় হয়ে গেছে আমার চোখ।

‘প্রথমবার পালিয়ে ওখানেই চলে গিয়েছিল, ভুলে গেছ? সেই প্রথম যেদিন গ্রীন ভ্যালিতে বাড়ি দেখতে এসেছিলাম? ওই গোরস্থানেই চলে গিয়েছিল ও।’

‘কিন্তু আজ বিকেলে গোরস্থানে তো গেছি আমরা...’ বলতে গেলাম।

বাধা দিল সুজা। ‘গোরস্থানের পাশ দিয়ে গেছি, ভিতরে ঢুকিনি। ওখানেই আছে ও, ভাইয়া। আমি জানি। তুমি না গেলেও আমি যাবই।’

‘সুজা, মাথা গরম করো না,’ ওর কাঁধে হাত রাখলাম। ওর গায়ের কাঁপুনি অবাক করল আমাকে। ‘গোরস্থানে যাবে কেন কিটু?’

‘প্রথমবার গিয়েছিল কেন?’ সুজা বলল। ‘নিশ্চয় কিছু একটা

খুঁজতে। কোন কিছুই গন্ধ গুঁকে গুঁকে। আমি শিওর, আবারও ওখানেই গেছে।' আমার হাতটা সরিয়ে দিল ও। 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না তা-ই বলো।'

বুঝলাম, ওকে ঠেকানো যাবে না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ও যাবেই।

'সুজা, রাত দুপুরে সত্যি তুমি একটা অপরিচিত গোরস্থানে ঢুকতে চাও?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি ভয় পাচ্ছি না,' সারাঘরে টর্চের উজ্জ্বল আলো বোলাল ও।

মনে হলো এক পলকের জন্যে কাউকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখলাম। চিৎকার করতে মুখ হাঁ করেও থেমে গেলাম। আর দেখলাম না।

'তুমি যাবে, নাকি যাবে না?' অধৈর্য হয়ে উঠল সুজা।

'না' বলে দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারপর পর্দার দিকে তাকিয়ে মনে হলো এই ঘরটাও তো ভূতুড়ে।

'হ্যাঁ, যাব,' অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। 'কাপড়টা বদলে নিই।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বলে টর্চ নিভিয়ে দিল ও। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘরটা। 'আমি ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় থাকব।'

'সুজা,' আমি বললাম, 'গোরস্থানে গিয়ে কিন্তু দেরি করব না আমরা। চট করে একবার দেখেই চলে আসব, ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। মা আর বাবা আসার আগেই চলে আসতে হবে আমাদের, জানি।' পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ও। একটু পরে সিঁড়িতে ওর সতর্ক পায়ের শব্দ শুনলাম।

এত রাতে গোরস্থানে যাব! ভাবতেও গা-টা শিরশির করে উঠল। গ্রীন ভ্যালিতে বলেই বোধহয় পারছি। এখানকার পরিবেশ দুঃসাহসী হতে বাধ্য করেছে আমাদের।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে কয়েকটা পোশাক নিয়ে পরতে শুরু করলাম। সুজার ধারণা ঠিক হবে কি না জানি না। এই রাতের বেলা কেন গোরস্থানে যাবে কিটু? কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

তবে বেশিদূর যেতে হবে না আমাদের, এটাই সান্ত্বনা। যাও, যাও, দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে, নিজেকে বুঝিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম। পরে নেডকে চিঠি লিখে জানাতে পারবে।

আর সুজার কথা যদি ঠিক হয়, খুঁজে পাই কিটুকে, তাহলে তো একটা কাজের কাজ হবে।

কয়েক মিনিট পর, জিনস আর পুরো হাতাওয়ালা শার্ট পরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কথামত ড্রাইভওয়ার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সুজা। রাতটা এখনও গরম। ভারি মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। প্রথমবারের মত লক্ষ করলাম, আমাদের ব্লকে রাস্তায় বাতি নেই।

মরা পাতা মাড়ানোর মরমর শব্দ তুলে টর্চের আলোয় পথ দেখে হেঁটে চললাম আমরা। আমাদের ব্লক পেরিয়ে স্কুলের কাছে চলে এলাম। এখান থেকে গোরস্থানটা মাত্র দুই ব্লক দূরে।

‘এত অন্ধকার,’ ফিসফিস করে বলল সুজা।

‘হ্যাঁ, আর অতিরিক্ত নীরব,’ আমি বললাম। বাড়িঘরগুলো কালো আর নীরব। বাতাস প্রায় নেই। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আমরাই বেঁচে থাকা দুটি মানুষ।

সুজার সঙ্গে তাল রাখতে দ্রুত পা চালাতে হচ্ছে আমাকে। ‘একটা ঝাঁঝিও ডাকছে না। এখনও ভেবে দেখো, সত্যি গোরস্থানে

যেতে চাও?’

‘চাই,’ সুজা বলল। রাস্তার ওপর গোল হয়ে পড়া টর্চের উজ্জ্বল আলোটা আগে আগে চলেছে, আর ওটাকে অনুসরণ করে যেন এগিয়ে চলেছে ও। ‘আমি জানি, কিটু ওখানেই আছে।’

প্রায় দুই ব্লক চলে এলাম। স্কুলটা এখন চোখে পড়ছে। আর ঠিক এই সময় পিছনে পায়ের শব্দ কানে এল।

সুজা আর আমি, দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলাম। আলোটা আরেকটু নিচু করল সুজা।

দুজনেই শুনেছি শব্দটা। তারমানে এবার আর ব্যাপারটা আমার কল্পনা নয়।

কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।



বারো

চমকে গেছে সুজা। টর্টটা ওর হাত থেকে রাস্তায় পড়ে ঝানঝান করে উঠল। কেঁপে উঠল আলোটা, কিন্তু নিভল না।

সুজা ওটা তুলে নেবার আগেই আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল অনুসরণকারী। ঘুরে তাকালাম ওর দিকে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা।

‘হ্যারি! তুমি!’ বলে উঠলাম।

আলো ঘুরিয়ে ওর মুখে ফেলল সুজা। ঝট করে হ্যারির দুই হাত উঠে গেল ওর মুখের কাছে, চোখ ঢাকার জন্য। দ্রুত সরে গেল পিছনের অন্ধকারে। ‘এখানে কী করছ তোমরা?’ চেষ্টায়ে উঠল ও। চমকে গেছে। চোখে আলো পড়ায় আমি যেমন চমকে গিয়েছিলাম।

‘তুমি...তুমি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছ,’ রাগতস্বরে জবাব দিল সুজা। টর্চ আবার নামিয়ে নিয়েছে। আলো পড়ছে এখন আমাদের পায়ের কাছে।

‘সরি,’ হ্যারি বলল। ‘চিনতে পারিনি। তোমরা বেরিয়েছ জানলে ডাক দিতাম।’

‘সুজা বলছে কিটু কোথায় আছে ও জানে,’ হ্যারিকে বললাম। এখনও হাঁপাচ্ছি আমি। ‘কুকুরটাকে খুঁজতে এখানে এসেছি আমরা।’

‘কিন্তু তুমি বেরোলে কেন?’ সুজা জিজ্ঞেস করল।

‘মাঝে মাঝে ঘুম আসে না আমার,’ মৃদুস্বরে জবাব দিল হ্যারি।

‘কিন্তু এত রাতে বেরোলে তোমার আব্বা-আম্মা রাগ করেন না?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

টর্চের আলোর আভায় দুট্টু হাসি খেলে যেতে দেখলাম ওর মুখে। ‘ওরা জানে না।’

‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই বলবে, না যাব?’ অস্থির ভঙ্গিতে সুজা বলল। জবাবের অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করল ও। প্রায় দৌড়ে চলেছে। ওর সামনের রাস্তায় নেচে নেচে চলল টর্চের আলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ওর পিছনে চললাম আমি। আলোর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করলাম।

‘কোথায় যাচ্ছ তোমরা?’ ডেকে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

‘গোরস্থানে,’ টেঁচিয়ে জবাব দিলাম।

‘না,’ শীতলকণ্ঠে হ্যারি বলল, ‘ওখানে যেয়ো না।’

দাঁড়িয়ে গেলাম। ‘মানে?’

‘ওখানে যেয়ো না,’ আবার একইভাবে বলল হ্যারি। ওর মুখ

দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকারে ঢাকা।

‘জলদি করো!’ ডাক দিল সুজা। একটুও গতি কমাচ্ছে না।
হ্যারির কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন বোধহয় খেয়াল করেনি ও।

‘খামো, সুজা!’ ডাক দিল হ্যারি। সেই একই রকম শীতল
কণ্ঠস্বর। ‘আমি বলছি, তোমরা ওখানে যাবে না!’

‘কেন যাব না?’ হঠাৎ করেই অস্বস্তি বোধ করলাম। আমাকে
আর সুজাকে হুমকি দিচ্ছে নাকি হ্যারি? এমন কিছু কী জানে ও, যা
আমরা জানি না? নাকি আবার আমি একটা ভুল সন্দেহ করছি?

অন্ধকারে তাকিয়ে ওর চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম।

‘রাতের বেলা ওখানে যাওয়াটা পাগলামি!’ হ্যারি বলল।

ওকে ভুল বুঝেছি আমি, ভাবলাম। আসলে ওখানে যেতে ভয়
পাচ্ছে ও। সেজন্য আমাদেরকেও ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

‘অ্যাই, তোমরা কি যাবে?’ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সুজা।

‘যাওয়াটা উচিত হবে না,’ হ্যারি বলল।

হ্যাঁ, ও ভয়ই পাচ্ছে। শীতলকণ্ঠস্বর নেহায়েতই আমার
কল্পনা।

‘তুমি যেতে না চাইলে যেয়ো না,’ সুজা বলল। ‘তবে আমরা
যাব।’ গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও।

‘না, সত্যি বলছি,’ হ্যারি বলল, ‘ওটা খুব খারাপ জায়গা।
দুজনে পাশাপাশি দৌড়াচ্ছি এখন। সুজার কাছে যাওয়ার চেষ্টা
করছি।

‘যেতেই হবে আমাদের,’ সুজা বলল। ‘কিটু ওখানেই আছে।
আমি শিওর।’

অন্ধকার, নীরব স্কুলবাড়িটা পেরিয়ে এলাম আমরা। মোড়
ঘুরলাম। গোরস্থানের রাস্তায় উঠলাম। সুজার টর্চের আলো পড়ছে

গাছের নিচু ডালগুলোতে ।

‘দাঁড়াও, প্লিজ,’ হ্যারি বলল ।

কিন্তু একটুও গতি কমাল না সুজা । আমিও না । ওখানে গিয়ে
যা দেখার দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাইছি আমি ।

শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম । বাতাস নেই ।
ভারি, স্থির হয়ে আছে পরিবেশ । শীত লাগবে ভেবে পুরো
হাতাওয়ালা শার্ট পরেছিলাম । ভুল হয়ে গেছে । চুলে হাত দিলাম ।
ঘামে ভিজে গেছে ।

গোরস্থানে যখন পৌঁছলাম, আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা ।
জায়গাটা নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা । একটা গেট পেরোলাম ।
এলেমেলো বসানো কবরফলকগুলো অন্ধকারেও চোখে পড়ছে ।

পাথর থেকে পাথরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুজার টর্চের আলো ।
‘কিটু!’ হঠাৎ নীরবতা ভেঙে গেল ওর চিৎকারে ।

মৃতদের ঘুম ভাঙাচ্ছে ও! কথাটা ভাবতেই ভয়ের শিহরণ
খেলে গেল আমার মেরুদণ্ডে ।

জোর করে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করলাম ।

‘আমার নিষেধ শোননি,’ আমার প্রায় গা ঘঁষে দাঁড়িয়ে বলল
হ্যারি । ‘খুব বিপদ হবে । এখনও সময় আছে, ফিরে যাও!’

‘কিটু! কিটু!’ চিৎকার করে ডাকল আবার সুজা ।

‘আমি জানি কাজটা ভাল করিনি,’ অস্বীকার করলাম না । ‘কিন্তু
একা একা সুজাকে এখানে আসতে দিলে আরও খারাপ করতাম ।’

‘কারোরই এখানে আসা উচিত নয়,’ হ্যারি বলল ।

বিরক্ত লাগল । ও চলে গেলেই ভাল হতো ।

‘অ্যাঁই, দেখো!’ সামনে কয়েক গজ দূর থেকে ডেকে বলল
সুজা ।

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে দৌড়ে চললাম ওর কাছে, কবরের সারির মাঝখান দিয়ে। বুঝতেই পারিনি, গোরস্থানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি।

‘দেখো,’ আবার বলল সুজা। গোরস্থানের কিনারে অদ্ভুত একটা কাঠামোয় আলো ফেলেছে ও।

টর্চের ছোট্ট গোল আলোয় জিনিসটা চিনতে সময় লাগল আমার। এখানে এ জিনিস আশা করিনি। পাথরের একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ডিম্বাকৃতি মঞ্চটার চারপাশ ঘিরে সারি সারি বেঞ্চ, সেগুলোও পাথরের তৈরি। সিঁড়ির মত ধাপ তৈরি করে সেগুলোতে রাখা হয়েছে ওই বেঞ্চ। অনেকটা আউটডোর থিয়েটার বলা যায় জায়গাটাকে।

‘আশ্চর্য!’ চৈঁচিয়ে উঠলাম।

ভাল করে দেখার জন্য সামনে এগোলাম।

‘রেজা, দাঁড়াও! চলো বাড়ি ফিরে যাই,’ হ্যারি বলল। আমার হাত চেপে ধরতে থাকা মারল। কিন্তু আমি ততক্ষণে সরে গেছি। বাতাসে খামচি দিল ওর আঙুলগুলো।

‘অদ্ভুত!’ আমি বললাম। ‘গোরস্থানের পাশে এ রকম খোলা জায়গায় থিয়েটারের মঞ্চ বানাল কে?’

সুজা আর হ্যারি আমাকে অনুসরণ করছে কি না দেখার জন্য ফিরে তাকালাম। আরেক দিকে তাকিয়ে এগোতে গিয়ে জুতোর ডগা বাধল কীসে যেন। উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। হাঁটুতে বাড়ি লাগল প্রচণ্ড জোরে।

‘আঁউ!’ করে উঠলাম। আপনাআপনি গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ‘কীসে লাগল?’

আলো ফেলল সুজা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটু ব্যথা

করছে। ঢালের গায়ে মাটি থেকে বেরিয়ে থাকা মস্ত একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়েছি আমি।

হাত কাঁপছে সুজার। টর্চের আলোটাও কাঁপছে। সেই আলোয় শিকড়টাকে অনুসরণ করে আমার দৃষ্টি চলে গেল কয়েক গজ দূরের মোটা, পুরানো গাছটার ওপর। অদ্ভুত মঞ্চের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে রয়েছে গাছটা, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে কাত হয়ে টলে পড়ে যাবে। গোড়ায় বড় বড় শিকড় টান লেগে উপড়ে এসেছে। গাছটার বড় বড় ডাল আর ঘন পাতা ছাতার মত ছড়িয়ে আছে মঞ্চের ওপর।

‘এটা কী?’ চৈঁচিয়ে উঠল সুজা।

‘অদ্ভুত!’ আবার বললাম আমি। ‘হ্যারি, ওখানে কী হয়?’

‘মিটিং,’ শান্তকণ্ঠে জবাব দিল হ্যারি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, ঝুঁকে থাকা গাছটার দিকে। ‘ওই জায়গাটাকে এখন টাউন হল হিসেবে ব্যবহার করে। শহরের লোকেরা মিটিং করে ওখানে।’

‘এই গোরস্থানের মধ্যে?’ চৈঁচিয়ে উঠলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে আমার কাছে।

‘চলো যাই,’ হ্যারি বলল। ভীষণ অস্বস্তিতে আছে মনে হলো।

পায়ের শব্দ কানে এল এই সময়। আমাদের পিছনে, কবরফলকগুলোর কাছ থেকে আসছে। ফিরে তাকালাম। টর্চের আলো ফেলল সেদিকে সুজা।

‘কিটু!’ চৈঁচিয়ে উঠল ও।

কাছেই কয়েকটা নিচু কবরফলকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা। বিশ্বাস করতে পারছি না! বললাম, ‘সুজা, ঠিকই তো বলেছিলে!’

‘কিটু! কিটু!’ ডাকল সুজা।

দুজনেই দৌড়াতে শুরু করলাম কুকুরটার দিকে।

কিন্তু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে পিঠটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে ফেলল কিটু। দৌড়ে পালাতে তৈরি। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। টর্চের আলোয় চোখ দুটো চুনি পাথরের মত জ্বলছে।

আশ্চর্য! ওর চোখ তো কখনও এভাবে জ্বলতে দেখিনি!

‘কিটু! অ্যাই কিটু! কাছে আয়!’ ডাক দিলাম।

মাথা নিচু করে দুলকি চালে হাঁটতে শুরু করল কুকুরটা। চলে যাচ্ছে।

‘কিটু, কোথায় যাচ্ছিস!’ সুজা বলল। ‘আমাদের চিনতে পারছিস না?’

এক দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে চেপে ধরল সুজা। মাটি থেকে তুলে নিল। ‘যাচ্ছিস কোথায় তুই?’

আমিও দৌড়ে গেলাম।

হঠাৎ হাত থেকে কিটুকে ফেলে দিয়ে পিছিয়ে এল সুজা। ‘এঁহু, কী দুর্গন্ধ!’

‘কীসের দুর্গন্ধ?’ বুঝতে পারলাম না।

‘কিটুর!’ নাক কুঁচকে রেখেছে সুজা। ‘মরা ইঁদুরের গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে।’

ধীরে হেঁটে সরে যাচ্ছে কিটু।

‘সুজা, আমাদের দেখে ও খুশি হয়নি,’ ককিয়ে উঠলাম। ‘এমন ভাব করল যেন চিনতেই পারেনি আমাদের!’

কবরফলকের পরের সারিটার কাছে চলে গেছে ও। থামল। ফিরে তাকাল আমাদের দিকে, জ্বলন্ত চোখে।

অসুস্থ বোধ করছি। কিটুর কী হয়েছে? এমন আজব আচরণ

করছে কেন ও? আমাদের দেখে খুশি হলো না কেন?

‘নাহ্, বুঝলাম না,’ এখনও নাকমুখ কুঁচকে রেখে যেন দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে চাইছে। ‘তিরিশ সেকেন্ড আমাদের না দেখলে পাগল হয়ে যায়। আর এতক্ষণ পর দেখেও ও পালাচ্ছে!’

‘আমাদের এখন যাওয়া দরকার!’ হ্যারি বলল। গোরস্থানের কিনারে গাছটার কাছেই এখনও দাঁড়িয়ে আছে ও।

‘কিটু, কী হলো তোর?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি। সাড়া দিল না ও। ‘তুই কি তোর নামও চিনতে পারছিস না? কিটু? অ্যাই কিটু?’

‘ওর গায়ে যা গন্ধ হয়েছে!’ চৈঁচিয়ে উঠল সুজা। ‘ওয়াক! থুহ্!’

‘বাড়ি গিয়ে ভালমত গোসল করালেই গন্ধ চলে যাবে,’ আমি বললাম। আমার গলা কাঁপছে। খুব মন খারাপ লাগছে। সেইসঙ্গে ভয়।

‘হয়তো ওটা কিটু নয়,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে সুজা বলল।

টর্চের আলোয় আবার লাল হয়ে জ্বলতে দেখলাম ওর চোখ দুটো।

‘কিটুই,’ শান্তকণ্ঠে বললাম। ‘দেখো। শিকলটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওটাই তুমি পরিয়েছিলে। সুজা, ধরো ওকে। বাড়ি নিয়ে চলো।’

‘তুমি ধরো!’ সুজা বলল। ‘এত দুর্গন্ধ, বাপরে!’

‘শিকলের মাথাটা ধরলেই তো হয়। কোলে নেয়ার তো দরকার নেই।’

‘না, আমি পারব না।’

আবার জেদ শুরু করেছে সুজা। বুঝলাম, চাপাচাপি করে লাভ হবে না। ‘বেশ, আমিই ধরছি। দেখি, লাইটটা দাও।’ সুজার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে কিটুর দিকে ছুটলাম।

‘দাঁড়া, কিটু, যাবি না!’ আদেশের সুরে বললাম। আমি এভাবে বললে কখনও অমান্য করে না ও।

কিন্তু এখন কথা শুনল না। দৌড়াতে শুরু করল। মাথা নিচু করে রেখেছে।

‘কিটু, থাম! অ্যাই কিটু, থাম বলছি!’ অধৈর্য হয়ে চেষ্টা করে উঠলাম। ‘তোরা পিছনে এখন ছুটে পারব না।’

‘ওকে যেতে দিয়ো না!’ আমার পিছন থেকে চেষ্টা করে বলল সুজা।

একটা কবরফলকের কাছে গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল কুকুরটা। এপাশ ওপাশ আলো ফেলে দেখতে দেখতে বললাম, ‘গেল কোথায়?’

‘কিটু! কিটু!’ তীক্ষ্ণস্বরে চেষ্টা করে উঠল সুজা।

কিন্তু কুকুরটাকে দেখলাম না।

‘সর্বনাশ! আবার হারিয়ে ফেললাম নাকি!’ আমি বললাম।

‘কিটু! কিটু!’

একসঙ্গে ওর নাম ধরে চেষ্টা করে ডাকলাম দুজনে।

‘হলো কী ওটার!’ আমি বললাম।

কবরফলকের লম্বা একটা সারির ওপর আলো ফেললাম। একটা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে আরেকটার ওপর সরিয়ে নিতে লাগলাম আলো। কিন্তু কোন চিহ্নই নেই কুকুরটার। বার বার ওর নাম ধরে ডাকতে লাগলাম দুজনে।

থ্যানিট পাথরে তৈরি একটা কবরফলকের ওপর আলো পড়ল।

পাথরে লেখা নামটা পড়ে থমকে গেলাম আমি। একটা মুহূর্ত মাথায় ঢুকল না কিছু। তারপর সুজার হাত আঁকড়ে ধরলাম।

‘সুজা, দেখো!’

‘কী?’ বুঝতে পারল না সুজা।

‘ওই যে, পাথরের ওপর লেখা নামটা পড়ো।’

নামটা পড়ল সুজা: এরিকা গারনার। আমার দিকে তাকাল। এখনও বুঝতে পারেনি ও।

‘আমাদের নতুন বন্ধু এরিকা,’ আমি বললাম। ‘যার সঙ্গে রোজ আমাদের প্লেগ্‌হাউন্ডে দেখা হয়, রোজ যার সঙ্গে কথা বলি, তার নাম।’

‘ওর নাম হয় কী করে? নিশ্চয় এরিকার দাদী,’ বলে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সুজা। ‘এসো, কিটুকে খুঁজি।’

‘না, দাঁড়াও। তারিখটা দেখি,’ আমি বললাম।

দুজনেই পড়লাম এরিকা গারনারের নামের নীচে লেখা তারিখটা। ১৯৬০-১৯৭২।

‘ওর দাদী তো নয়ই, মা-ও নয়,’ আমি বললাম। হাত কাঁপছে আমার। ‘মাত্র বারো বছর বয়েসে মারা গেছে কবরের এই মেয়েটা। আর এরিকার বয়েসও বারো, ও আমাকে বলেছে।’

আরেক দিকে চোখ ফেরাল সুজা। কিটুকে খুঁজছে।

কিন্তু আমি এগিয়ে গেলাম পরের কবরফলকটার দিকে। এটার ওপর যে নামটা লেখা রয়েছে, সেটা কখনও শুনিনি। তারপরের ফলকটার দিকে এগোলাম। এখানে যে নাম লেখা, সেটাও শুনিনি।

‘ভাইয়া, চলো!’ গুঁড়িয়ে উঠল সুজা।

কিন্তু তার পরের নামটা আমার পরিচিত। টমাস হার্ডি। ১৯৭৫-১৯৮৮।

‘টমাস, দেখো! আমাদের প্লেগ্‌হাউন্ডের ছেলে!’

‘ভাইয়া, কিটুকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,’ সুজা

বলল।

কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল কবরফলকগুলোর কাছ থেকে সরতে দিল না আমাকে। একটা থেকে আরেকটা, তারপর আরেকটার ওপর আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগলাম।

আতঙ্ক যেন সাঁড়াশির মত চেপে ধরছে আমাকে। জিম বাটলারের নামটা খুঁজে পেলাম। তারপর পেলাম টনি এরিকসনকে।

এদের সবার সঙ্গে সফটবল খেলি আমরা। আর এদের সবার নামই রয়েছে এখানে।

বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটাচ্ছে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা। কবরফলকের সারির পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। নরম ঘাসে জুতো ডেবে যাচ্ছে। কেমন অবশ অবশ লাগছে দেহটা। সারির শেষ ফলকটার ওপর আলো ফেললাম। হাত এত কাঁপছে, আলোটা সোজা করে ধরে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে।

হ্যারি ব্যানার। ১৯৭৭-১৯৮৮।

আমাকে ডাকল সুজা। কী বলল, যেন কানেই ঢুকল না আমার।

মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা দুলছে। গভীরভাবে খোদাই করা নামটা পড়লাম আরেকবার।

হ্যারি ব্যানার। ১৯৭৭-১৯৮৮।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অক্ষর আর সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে। উত্তেজনায় ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল ওগুলো চোখের সামনে। পড়তে পারছি না আর।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, কবরফলকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। আমার দিকে তাকিয়ে।

‘হ্যারি,’ বলে আবার আলো ফেললাম ফলকের লেখার ওপর ।
‘হ্যারি, এই ফলকটা কি তোমার?’

জ্বলে উঠল হ্যারির চোখ । জ্বলন্ত কয়লার মত ।

‘হ্যাঁ, আমার,’ মৃদুস্বরে বলল ও । এগোতে শুরু করল আমার
দিকে । ‘আমি দুঃখিত, রেজা ।’



তেরো

এক পা পিছলাম। নরম মাটিতে আমার জুতো ডেবে যাচ্ছে।
বাতাস ভারি। স্থির হয়ে আছে। কোন শব্দ নেই। কেউ নড়ছে না।

মৃতের জগতে রয়েছি আমরা।

মৃতেরা ঘিরে রেখেছে আমাদের, ভাবলাম।

বরফের মত জমে গেছে যেন শরীর। অন্ধকার যেন পাক খেয়ে
ঘুরছে আমার চারপাশে। মনে হচ্ছে বনবন করে ঘুরছে
কবরফলকগুলো।

‘হ্যারি,’ আবার বললাম। খুবই মৃদু স্বরে। ‘হ্যারি, সত্যি কি
তুমি মারা গেছ?’ বহুদূর থেকে ভেসে এসে কানে লাগল যেন
আমার নিজের কথাগুলোই।

‘এ জন্যেই আসতে নিষেধ করেছিলাম,’ রাতের ভাপসা

বাতাসে যেন ঢেউয়ের মত ভেসে এল হ্যারির কণ্ঠ। ‘এত তাড়াতাড়ি তোমাদের জানতে দিতে চাইনি।’

‘কিন্তু...কীভাবে? মানে...আমি বুঝতে পারছি না...’ টর্চের আলোয় দূরে তাকালাম। প্রায় রাস্তার কাছে চলে গেছে সুজা। এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে কিটুকে।

‘সুজা!’ ফিসফিস করে বললাম। জোরে ডাক দিতে ভয় পাচ্ছি। ভয় যেন গলা টিপে ধরেছে আমার। পেটের ভিতর খামচে ধরা অনুভূতি।

‘কুকুররা এ-সব বুঝতে পারে,’ নিচু, ভোঁতা স্বরে বলল হ্যারি। ‘জীবন্যুতদের চিনতে পারে। এ কারণেই ওদেরকে আগে শেষ করে দেয়া হয়। ওরা চিনে ফেলে বলেই।’

‘তারমানে...কিটু...মারা গেছে?’ বহু কষ্টে একটু একটু করে যেন কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার গলার ভিতর থেকে।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। ‘কারও সঙ্গে কুকুর থাকলে প্রথমেই সেগুলোকে মেরে ফেলা হয়।’

‘না!’ চিৎকার দিয়ে আরেক পা পিছিয়ে গেলাম। মার্বেল পাথরে তৈরি নিচু একটা স্তম্ভের গোড়ায় পা বেধে আরেকটু হলেই উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম। লাফিয়ে সরে গেলাম ওটার কাছ থেকে।

‘এখনই এ-সব তোমার দেখে ফেলা উচিত হয়নি, রেজা,’ হ্যারি বলল। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই ওর, কেবল চোখের তারায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া। ‘এত তাড়াতাড়ি সত্যি তোমার জানা উচিত হয়নি। অন্তত আরও কয়েকটা সপ্তাহ যাওয়া দরকার ছিল। আমাকে নজর রাখার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। সময় হওয়ার আগে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই ছিল আমার কাজ, যাতে এগুলো দেখতে না পারো।’

আমার দিকে আরেক পা এগোল ও। লাল হয়ে জ্বলে উঠল চোখ। সেই চোখ থেকে রশ্মি বেরিয়ে এসে যেন বিদ্র হতে থাকল আমার চোখে।

‘জানালায় দাঁড়িয়ে তুমিই কি সেদিন আমায় দেখছিলে?’
চৈঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ‘আমার ঘরের জানালায়?’

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। ‘হ্যাঁ। আমি তোমাদের বাড়িতেই থাকি।’ আরও এক পা আগে বাড়ল ও। ঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের স্তম্ভটার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। ‘নজর রাখা আমার কাজ।’

ওর জ্বলন্ত চোখ থেকে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিতে চাইলাম। চিৎকার করে সুজাকে বলতে চাইলাম কাউকে যেন ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু অনেক দূরে চলে গেছে ও। আমি দাঁড়িয়ে আছি, পাথরের মূর্তি হয়ে। আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে যেন আমার দেহ।

‘তাজা রক্ত দরকার আমাদের,’ হ্যারি বলল।

‘কী?’ চৈঁচিয়ে উঠলাম। ‘কী বলছ তুমি?’

‘তাজা রক্ত ছাড়া বাঁচতে পারি না আমরা। সেজন্যেই তোমাদের মত জ্যান্ত মানুষদের দরকার হয়। কেন ডেকে আনা হয়েছে তোমাদের, শীঘ্রি সেটা বুঝতে পারবে তুমি, রেজা। বুঝতে পারবে কেন তোমাদেরকে খাতির করে এনে জায়গা দেয়া হয়েছে পুরানো বাড়িটাতে। ওটা মৃত্যুপ্রাসাদ, রেজা।’

হ্যারির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম টর্চের আলোকরশ্মি গিয়ে যেখানে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, সেদিকে। ফিরে আসছে সুজা। আমাদের দিকে এগোচ্ছে।

পালাও, সুজা, মনে মনে বললাম। জলদি ভাগো এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি পারো কাউকে ডেকে নিয়ে এসো।

কথাগুলো শুধুই ভাবছি। চিৎকার করে বলতে পারছি না কেন?
আরও উজ্জ্বল হচ্ছে হ্যারির চোখ। আমার ঠিক সামনে এসে
দাঁড়িয়েছে এখন। শক্ত, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল।

‘হ্যারি?’ স্তম্ভে পিঠ ঠেকে গেছে আমার। মোটা জিনসের
কাপড় ভেদ করেও আমার গায়ে লাগছে মার্বেলের ঠাণ্ডা।

‘নজর রাখার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর,’ হ্যারি বলল।
‘ঠিকমত পালন করতে পারিনি। উল্টোপাল্টা করে দিয়েছি।
এজন্যে আমাকে শাস্তি পেতে হবে।’

‘হ্যারি, কী করতে চাও তুমি?’

‘তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে,’ চঞ্চল হলো হ্যারির দৃষ্টি।
‘রেজা, আমি সত্যি দুঃখিত।’

মাটি থেকে নিজেকে উঁচু করছে ও, আমার কাছে ভেসে
আসার জন্য।

দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। দম নিতে পারছি না। নড়তে
পারছি না। চিৎকার করে সুজাকে ডাকতে চাইলাম। স্বর বেরোল
না।

সুজা? কোথায় তুমি?

আরেকটু ওপরে উঠল হ্যারি। সাঁতারের ভঙ্গিতে মাটির সঙ্গে
সমান্তরাল করল দেহটাকে। ভেসে এল আমার মাথার ওপর।
কোনও অলৌকিক শক্তিবলে আমাকে দম নিতে দিচ্ছে না। চোখ
ধাঁধিয়ে ফেলছে। শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

আমি শেষ, ভাবলাম। মারা যাচ্ছি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হ্যারিদের দলে চলে যাব আমিও।



চোদ্দ

তারপর, হঠাৎ করেই, অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল।

আলো পড়ল হ্যারির মুখে। উজ্জ্বল সাদা হ্যালোজেন লাইট।

‘কী ব্যাপার?’ সুজা জিজ্ঞেস করল। তীক্ষ্ণ, ভীত শোনাল ওর কণ্ঠটা। ‘রেজা, কী হয়েছে?’

চিৎকার দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে নামল হ্যারি। ‘সরাও ওটা! সরাও! আলো নিভাও!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ও। গলা থেকে একধরনের ফিসফিসে শব্দ ভেসে এল, ভাঙা জানালার কাচের ভিতর দিয়ে জোরাল বাতাস বওয়ার মত।

কিন্তু হ্যারির মুখে আলোটা ধরেই রাখল সুজা। ‘কী হয়েছে? কী করছিলে তুমি?’

আবার দম নিতে পারছি আমি। আলোটার দিকে তাকিয়ে

নিজের বুকের ধড়াস ধড়াস কমানোর চেষ্টা করলাম।

দুই হাত তুলে আলো থেকে মুখ আড়াল করতে চাইছে হ্যারি।
কী হচ্ছে ওর, বুঝতে পারছি না। তবে উজ্জ্বল আলো ওর ক্ষতি যা
করার ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে।

মনে হচ্ছে গলে যাচ্ছে হ্যারির চামড়া। মুখের মাংস ধসে, বসে
যাচ্ছে হাড়ের ফাঁকে। দেখতে দেখতে কঙ্কালের খুলির হাড় ছাড়া
আর কিছুই রইল না।

উজ্জ্বল সাদা গোল আলোটোর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি
না আমি। হ্যারির গায়ের চামড়া, মাংস সব গলে গলে পড়ছে।
ভিতরের হাড় বেরিয়ে আসছে। চোখের কোটর থেকে চোখ দুটো
বেরিয়ে মাটিতে পড়ল নিঃশব্দে।

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গিয়েও কোনমতে আলোটা শক্ত করে ধরে
রাখল সুজা। বিকট হাসিতে দাঁত বের করা খুলিটার দিকে তাকিয়ে
আছি আমরা। কোটরের কালো গর্ত দুটো যেন এখনও আমাদের
দেখছে।

হ্যারিকে আমার দিকে এক পা এগোতে দেখে চৈঁচিয়ে
উঠলাম।

পরক্ষণে বুঝলাম, আমার দিকে এগোচ্ছে না, টলে পড়ে যাচ্ছে
ওর কঙ্কালটা।

লাফিয়ে সরে গেলাম একপাশে। মার্বেলের স্তম্ভটার ওপর
আছড়ে পড়ল কঙ্কালের মাথা। ঠুস করে কুৎসিত শব্দ তুলে ফেটে
গেল।

‘চলো!’ চৈঁচিয়ে উঠল সুজা। ‘রেজা, চলো!’ আমার হাত ধরে
টেনে সরিয়ে নিতে চাইল ও।

কিন্তু হ্যারির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছি না আমি।

চামড়া, মাংস কিছুই নেই। কতগুলো হাড় পড়ে রয়েছে।

‘রেজা, এসো!’

তারপর, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দেখি দৌড়াছি। প্রাণপণে। সুজার পাশাপাশি। কবরফলকের লম্বা সারির কিনার দিয়ে দৌড়ে চলেছি রাস্তার দিকে। দৌড়ানোর সময় ঝাঁকি লেগে নাচছে হাতের টর্চের আলো। ধূসর পাথরের ফলকগুলো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। পায়ের নীচে শিশিরে ভেজা নরম ঘাস। স্থির, গরম বাতাসে ঘাম বেরোচ্ছে আমাদের। হাঁপিয়ে যাচ্ছি।

‘মা আর বাবাকে বলা দরকার! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এ শহর থেকে!’ চেষ্টা করে বললাম।

‘কিন্তু ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না!’ সুজা বলল। ‘চোখে দেখেও আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না!’

রাস্তায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু দৌড়ানো থামলাম না। পাকা রাস্তায় আমাদের জুতোর শব্দ হচ্ছে ধূপধাপ করে।

‘কিন্তু বিশ্বাস করাতেই হবে!’ আমি বললাম। ‘যদি না করে, জোর করে বের করে নিয়ে যেতে হবে ওই বাড়িটা থেকে।’

‘কীভাবে?’

‘জানি না। আগে বাড়ি যাই, তারপর দেখা যাবে।’

নীরব, নির্জন, কালো রাস্তা ধরে দৌড়ে চলেছি আমরা। সামনে নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে টর্চের সাদা আলো। রাস্তায় বাতি নেই, আশেপাশের বাড়িঘরের জানালায় আলো নেই, একটা গাড়িও চলছে না।

এমনই একটা কালো শহরে থাকতে এসেছি আমরা। কী ভয়ঙ্কর!

পালানোর সময় হয়েছে। যতই দেরি করব, বিপদ বাড়বে।

বাকি পথটা দৌড়েই বাড়ি ফিরলাম আমরা। বার বার পিছনে ফিরে তাকাছি কেউ আসে কিনা দেখার জন্য। কাউকে দেখলাম না। আশপাশের সমস্ত বাড়িগুলো নির্জন, শূন্য দেখাচ্ছে।

গায়ের একপাশে ব্যথা করছে আমার। কিন্তু থামলাম না। খোয়া বিছানো পথে এসেও গতি কমালাম না। ঝরা পাতা মাড়িয়ে এসে উঠলাম সামনের বারান্দায়।

দরজার পাল্লা ঠেলে খুলে ভিতরে ঢুকেই টেঁচানো শুরু করলাম, ‘বাবা! মা! কোথায় তোমরা?’

কারও জবাব এল না।

লিভিং রুমে ঢুকলাম। আলো জ্বলছে।

‘বাবা? মা? তোমরা কোথায়?’

খোদা, ওরা যেন বাড়িতেই থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করলাম। প্লিজ, থাকে যেন! প্রচণ্ড গতিতে রেসের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা। গায়ের একপাশে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

পুরো বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নেই ওরা।

‘পার্টিতে গেছে!’ হঠাৎ মনে পড়ায় চেষ্টা করে উঠল সুজা। ‘এখনও কি ওখানেই আছে নাকি?’

লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। জোরে জোরে দম নিচ্ছি। সামান্য কম মনে হলো দেহের ব্যথা। ঘরের সবগুলো আলো জ্বেলে দিলাম। কিন্তু তবু কেমন ভারি আর বিপজ্জনক মনে হলো ঘরের পরিবেশ।

ম্যান্টলের ওপরে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় দুটো বাজে।

‘এতক্ষণে চলে আসার কথা,’ গলা কাঁপছে আমার। দুর্বল লাগছে।

‘পার্টি থেকে ফিরে আবার কোথাও গেল নাকি? ফোন নম্বর রেখে গেছে কোনখানে?’ বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো সুজা।

ওর পিছন পিছন চললাম। যতগুলো বাতি আছে, সব জ্বেলে দিতে দিতে। কাউন্টারের যেখানে রশিদ আর হিসেবের কাগজগুলো রাখে বাবা-মা, আমাদের জন্য ওখানেই একটা প্যাডে নোট রেখে যায়।

কিন্তু প্যাডটা সাদা। কিছুই লিখে রেখে যায়নি।

‘ওদেরকে খুঁজে বের করা দরকার!’ সুজা বলল। ভীত মনে হচ্ছে ওকে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ‘এখান থেকে পালাতে হবে!’

মা-বাবারও কিছু ঘটল না তো?

সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম সুজাকে, কিন্তু সময়মত সামলে নিলাম। এমনিতেই ভয়ে কাতর হয়ে আছে ও, ওর ভয়টা আর বাড়তে চাইলাম না।

‘পুলিশকে খবর দেব নাকি!’ লিভিং রুমে ফিরে আসার সময় সুজা বলল। ঘরে ঢুকে সামনের জানালার কাছে এসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকলাম।

‘বুঝতে পারছি না,’ জবাব দিলাম। আমার গরম হয়ে ওঠা কপাল চেপে ধরলাম ঠাণ্ডা কাচে। ‘কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি মনে করেছিলাম, বাড়িতেই পাব। এখানে থাকলে এখন সবাই মিলে বেরিয়ে যেতে পারতাম।’

‘এত তাড়া কীসের তোমাদের?’ আমার পিছন থেকে বলে উঠল একটা মেয়ে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেলাম আমি আর সুজা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এরিকা গারনার। দুই হাত

আড়াআড়ি ভাঁজ করে রেখেছে বুকের ওপর।

‘তুমি, তুমি তো মৃত!’ বিড়বিড় করে বললাম।

হাসল ও। বিষণ্ণ, তিক্ত হাসি।

বারান্দা থেকে আরও দুটো ছেলে এসে ঘরে ঢুকল। একজন সুইচ টিপে আলোগুলো নিভিয়ে দিল। ‘বেশি আলো।’ এরিকার পাশে এসে দাঁড়াল ও।

তারপর, আরেকটা ছেলে, জিম বাটলার উদয় হলো ফায়ারপ্লেসটার কিনারে। খাটো করে ছাঁটা কালো চুলওয়ালা মেয়েটাকেও দেখতে পেলাম। সিঁড়িতে একেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম সেদিন। এখন আমার পাশে জানালার পর্দার কাছে এসে দাঁড়াল।

সবাই হাসছে ওরা। মৃদু আলোয় জ্বলছে ওদের চোখ। সুজা আর আমাকে ঘিরে ফেলছে।

‘কী চাও তোমরা?’ চিৎকার করে বললাম। ভয়ে বিকৃত শোনালা কণ্ঠটা। নিজের গলা নিজেই চিনতে পারছি না। ‘কী করবে?’

‘তোমাদের এই বাড়িতেই থাকতাম আমরা,’ মৃদুস্বরে জবাব দিল এরিকা।

‘আর এখন?’ চৈঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

‘তোমাদের এই বাড়িতেই থাকতাম আমরা,’ এরিকার মত একই কথা বলল টমাস। আমার প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ।

‘আর এখন কোথায় থাকো?’ আবার জিজ্ঞেস করলাম।

‘এখনও এই বাড়িতেই থাকি,’ জিম বলল। ‘তোমাদের এই বাড়িতে থাকতেই মারা গিয়েছিলাম আমরা। তোমরাও মরবে।’ ওর কথায় হাসল সবাই। খড়খড়ে, শুকনো, নিশ্প্রাণ হাসি। আমাকে আর সুজাকে ঘিরে এগিয়ে আসছে ওরা।



পনেরো

‘ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে!’ চেষ্টা করে উঠল সুজা।
‘আমাদেরকে খুন করবে!’

তাকিয়ে দেখছি আমি। নীরবে এগিয়ে আসছে ওরা। পিছিয়ে এসে সুজা আর আমি জানালার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম।
অন্ধকার ঘরের ভিতরে চোখ বুলিয়ে পালানোর পথ খুঁজলাম।

কিন্তু পালানোর পথ নেই।

‘এরিকা, তোমাকে দেখে কিন্তু খুব ভাল মেয়ে মনে হয়,’
কথাগুলো ছড়মুড় করে যেন বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

আরও উজ্জ্বল হলো এরিকার চোখ। ‘আসলেই ভাল ছিলাম
আমি,’ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ও, ‘এখানে আসার আগে।’

‘সবাই আমরা ভাল ছিলাম,’ বলল টমাস হার্ডি, একই রকম

নিচু, বিষণ্ণ কণ্ঠে। ‘কিন্তু এখন আমরা মৃত।’

‘আমাদের যেতে দাও!’ সুজা বলল। দুই হাত সামনে তুলে রেখেছে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে। ‘দোহাই তোমাদের, আমাদের যেতে দাও।’

আবার হেসে উঠল ওরা। সেই একই রকম রুক্ষ, কৰ্কশ, শুকনো হাসি। প্রাণহীন।

‘ভয় পেয়ো না, রেজা,’ এরিকা বলল। ‘শীঘ্রি আমাদের দলে চলে আসবে তোমরা। এ জন্যেই তোমাদেরকে এ বাড়িতে ডেকে আনা হয়েছে।’

‘বুঝলাম না তোমার কথা,’ গলা কাঁপছে আমার।

‘এটার নাম মৃত্যুপ্রাসাদ। গ্রীন ভ্যালিতে নতুন যারাই আসে, এই বাড়িতে ওঠে। তারপর ওদেরকে আমাদের দলে নিয়ে আসা হয়।’

কথাটা যেন রসিকতার মত মনে হলো অন্যদের কাছে। সবাই হেসে উঠল।

‘কিন্তু মবিন দাদা নামে আমাদের এক দাদা...’ বলতে গেল সুজা।

মাথা নাড়ল এরিকা। হাসিতে উজ্জ্বল চোখ। ‘না, সুজা। ওরকম কোন দাদা নেই তোমার, অন্তত এখানে। এটা শুধু ডেকে আনার একটা কৌশল। প্রতি বছর একবার করে নতুন কাউকে আনতে হয় এখানে। আমরাও এভাবেই এসেছিলাম। এই বাড়িতে থেকেছিলাম। মারা গিয়েছিলাম। এ বছর তোমাদের পালা।’

‘তাজা রক্ত দরকার আমাদের,’ জিম বাটলার বলল। মৃদু আলোয় লাল হয়ে জ্বলছে ওর চোখ। ‘প্রতি বছর একবার করে তাজা রক্তের প্রয়োজন হয়।’

আমাদের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওরা ।
 ভারি দম নিলাম । তারপর চোখ বুজলাম ।
 ঠিক এই সময় দরজায় থাবা দেয়ার শব্দ হলো ।
 জোরে জোরে থাবা দিচ্ছে কেউ ।
 চোখ মেললাম । ভূতুড়ে ছেলেমেয়েগুলো সব উধাও হয়েছে ।
 কিন্তু বাতাসে ওদের গায়ের দুর্গন্ধ রেখে গেছে ।
 একে অন্যের দিকে তাকালাম আমি আর সুজা । অবাক হয়ে ।
 আবার শোনা গেল জোরাল থাবা দেয়ার শব্দ ।
 ‘নিশ্চয় বাবা-মা এসেছে!’ চৈঁচিয়ে উঠল সুজা ।
 দরজার দিকে ছুটলাম দুজনে । অন্ধকারে না দেখে কফি
 টেবিলে হোচট খেল সুজা । ওর আগে আমি পৌঁছলাম দরজার
 কাছে ।
 ‘বাবা! মা!’ চৈঁচিয়ে বলে, একটানে দরজা খুলে দিলাম ।
 ‘কোথায় ছিলে তোমরা এতক্ষণ?’
 জড়িয়ে ধরার জন্য দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছি । ওই
 অবস্থাতেই থেমে গেল আমার হাত দুটো । শূন্যেই বাড়ানো রইল ।
 হাঁ হয়ে গেছি নীরব চিৎকারের ভঙ্গিতে ।
 ‘মিস্টার জোনস,’ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুজা ।
 ‘আমরা মনে করেছিলাম...’
 ‘মিস্টার জোনস, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে!’ আমি
 বললাম । দরজার পাল্লা পুরোটা খুলে দিলাম । ‘আসুন ।’
 ‘তোমরা ভাল আছ তো?’ আমাদের দুজনের ওপর চোখ
 বোলাচ্ছেন তিনি । তার সুন্দর চেহারাটা উদ্বেগে শক্ত হয়ে গেছে ।
 ‘মনে হচ্ছে একেবারে সময়মতই এসেছি?’
 ‘মিস্টার জোনস...’ এতই স্বস্তি বোধ করছি, আমার কথা

আটকে যাচ্ছে, চোখে পানি চলে এসেছে। ‘আমি...’

আমার হাত চেপে ধরলেন তিনি। ‘কথা বলার সময় নেই,’ পিছনের রাস্তার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। ড্রাইভওয়েতে তাঁর গাড়িটা দেখলাম। ইঞ্জিন চালু রেখে এসেছেন। পার্কিং লাইট জ্বালানো। ‘সময় থাকতে তোমাদেরকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি!’

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলাম।

মিস্টার জোনসও ওদের দলের নন তো?

‘জলদি করো,’ তাগাদা দিলেন তিনি। অস্বস্তিভরে অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছেন। ‘ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা।’

‘কিন্তু...’ বলতে গিয়ে তাঁর ভীত চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত কি না বুঝতে পারছি না।

‘পার্টিতে তোমাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমিও ছিলাম,’ মিস্টার জোনস বললেন। ‘হঠাৎ করেই চক্র তৈরি করে ঘিরে ফেলল ওরা। সবাইকে। তোমাদের বাবা, মা, আমাকে। চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে এগিয়ে এল ওরা।’

ঠিক আমাকে আর সুজাকে ঘিরে যেমন এগিয়েছিল, ভাবলাম।

‘ওদের চক্র ভেঙে পালিয়েছি আমরা,’ মিস্টার জোনস বললেন, পিছনের ড্রাইভওয়ের দিকে তাকিয়ে। ‘কোনমতে আমরা তিনজন বেরিয়ে এসেছি। জলদি করো। এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের, এখনি!’

‘সুজা, চলো,’ বলে মিস্টার জোনসের দিকে তাকালাম।

‘বাবা-মা কোথায়?’

‘এসো আমার সঙ্গে। আপাতত তাঁরা নিরাপদ জায়গায়ই আছেন। তবে কতক্ষণ নিরাপদ থাকবেন জানি না।’

মিস্টার জোনসের পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।
ড্রাইভওয়ে ধরে এগোলাম গাড়ির দিকে। আকাশে মেঘের স্তর ভাগ
হয়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা চাঁদ। ভোর
রাতের আকাশে অনেক নীচে যেন অসহায় ভঙ্গিতে বুলে থেকে
মলিন আলো বিতরণ করছে।

‘পুরো শহরটাই খারাপ,’ মিস্টার জোনস বললেন। সামনের
প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে ধরলেন আমার জন্য। সুজা নিজেই
দরজা খুলে পিছনের সিটে উঠে বসল।

কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে সিটে এলিয়ে পড়লাম আমি। দরজা লাগালেন
মিস্টার জোনস। তিনি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলে বললাম, ‘শহরটা
যে খারাপ, আমরা জানি। ‘সুজা আর আমি দুজনেই...’

‘এখান থেকে পালানো দরকার, ওরা আমাদেরকে ধরার
আগেই,’ দ্রুত গাড়ি পিছাতে শুরু করলেন মিস্টার জোনস। চাকার
তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ তুলে রাস্তায় উঠলেন।

‘হ্যাঁ,’ আমি বললাম। ‘একেবারে সময়মত এসেছিলেন
আপনি। ভূতুড়ে ছেলেমেয়েতে ভর্তি আমাদের বাড়িটা। সবাই ওঁরা
মারা গেছে...’

‘তারমানে ওদের দেখেছ তোমরা,’ মৃদুকণ্ঠে বললেন মিস্টার
জোনস। গ্যাস পেডাল চেপে ধরলেন জোরে।

বেগুনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছি। সবুজ গাছপালার
মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কমলা সূর্য। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস
করলাম, ‘কই, আমার বাবা-মা কোথায়?’

‘গোরস্থানের পাশে একটা আউটডোর থিয়েটার আছে,’
মিস্টার জোনস বললেন। সোজা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে
আছেন। চোখের পাতা সরু হয়ে গেছে। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে

গেছে মুখের পেশি। ‘খোলা জায়গায় তৈরি করা হয়েছে মঞ্চটা। বড় একটা গাছ দিয়ে আড়াল করা। আমি তাঁদের ওখানে রেখে এসেছি। ওখান থেকে সরতে মানা করেছি। আমার মনে হয় নিরাপদেই আছেন তাঁরা। ওখানে খোঁজার কথা ভাববে না কেউ।’

‘ওই জায়গাটা আমরা দেখেছি,’ সুজা বলল। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ পিছনের সিটে।

‘কীসের আলো?’ রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকালেন মিস্টার জোনস।

‘আমার টর্চের,’ সুজা বলল। সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল। ‘সাথে করে নিয়ে এসেছি, যদি কাজে লাগে। কিন্তু সূর্য উঠছে। আর এটার দরকার হবে বলে মনে হয় না।’

ব্রেক কষে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালেন মিস্টার জোনস। গোরস্থানের কিনারে পৌঁছে গেছি আমরা। তাড়াহুড়া করে গাড়ি থেকে নামলাম, বাবা-মাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি।

আকাশটা এখনও অন্ধকার। তাতে বেগুনি রঙের ছোঁয়া। গাছের মাথায় উঁকি দেয়া সূর্যটাকে দেখাচ্ছে একটা গাঢ় কমলা বেলুনের মত। রাস্তার অন্যপাশে, মাটি থেকে খোঁচা খোঁচা বেরিয়ে থাকা কবরফলকগুলোর শেষ মাথায়, রহস্যময় মঞ্চটা লুকিয়ে আছে ঝুঁকে থাকা যে বড় গাছটার আড়ালে, সেটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে এখান থেকে।

‘জলদি করো,’ তাড়া দিলেন মিস্টার জোনস। আস্তে করে লাগিয়ে দিলেন তাঁর পাশের দরজাটা। ‘তোমাদের দেখার জন্যে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছেন তোমাদের বাবা-মা।’

রাস্তা ধরে এগোলাম আমরা। প্রায় দৌড়ে চললাম। একহাতে টর্চটা আলতোভাবে ধরে রেখেছে সুজা।

গোরস্থানের কিনারে এসে হঠাৎ থেমে গেল ও। চোঁচিয়ে উঠল,
'কিটু!'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি কুকুরটা ধীরে ধীরে
হেঁটে চলেছে একসারি কবরফলকের কিনার দিয়ে।

'কিটু!' আবার চোঁচিয়ে ডাকল সুজা। দৌড় দিল কুকুরটার
দিকে।

ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতর। কিটুর ব্যাপারে হ্যারি
আমাকে যা বলেছিল, সুজাকে বলার সুযোগ পাইনি। চোঁচিয়ে
ডাকলাম, 'না, সুজা না!'

উদ্ভিগ্ন হলেন মিস্টার জোনস। 'সময় নেই আমাদের হাতে।
জলদি এসো,' আমাকে বললেন তিনি। তারপর সুজাকে ফিরে
আসার জন্য ডাকলেন।

'আমি ওকে নিয়ে আসি,' বলে দৌড় দিলাম। 'সুজা, যেয়ো
না! ওই কুকুরটার পিছনে যেয়ো না! ওটা মরে গেছে!'

কিটুর কাছাকাছি চলে গেছে ততক্ষণে সুজা। মাটি শুঁকতে
শুঁকতে হেঁটে চলেছে কুকুরটা। আমাদের দিকে নজরই নেই।
সুজার ডাকের সাড়া দিচ্ছে না। না দেখে এগোতে গিয়ে হঠাৎ
একটা কবরফলকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সুজা।

চিৎকার করে উঠল ও। হাত থেকে ছুটে উড়ে গিয়ে
কবরফলকে বাড়ি খেল টর্চটা।

দ্রুত গিয়ে ওকে ধরলাম। 'সুজা! ব্যথা পেয়েছে?'

উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও। নজর সামনের দিকে।

'সুজা! কথা বলছ না কেন? ব্যথা পেয়েছে?'

ওর কাঁধ চেপে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও
তাকিয়েই রইল সামনের দিকে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। চোখ বড়

বড়।

‘সুজা?’

‘দেখো,’ অবশেষে কথা বলল ও। বাকরুদ্ধ কিংবা বেহুঁশ হয়ে যায়নি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

‘দেখো,’ আবার বলল সুজা। যে পাথরটায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে সেটার দিকে আঙুল তুলল।

ফলকটার দিকে তাকলাম। খোদাই করা লেখাগুলো পড়লাম নীরবে: গ্র্যাম্পারসন জোনস। ১৯৫০-১৯৮০।

মাথার ভিতর চক্কর দিল আমার। টলে উঠলাম। কিন্তু সুজাকে ছাড়লাম না।

গ্র্যাম্পারসন জোনস!

মিস্টার জোনসের বাবা কিংবা দাদা নন। তিনি আমাদের বলেছেন, তাঁদের পরিবারে তিনিই একমাত্র গ্র্যাম্পারসন।

তারমানে মিস্টার জোনসও মারা গেছেন।

এ শহরের অন্য সবার মতই মৃত।

তিনিও ওদের একজন। জীবন্যুতদের একজন। যারা মরে গিয়েও বেঁচে আছে।

ভোরের বেগুনি অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমি আর সুজা। জীবন্যুতেরা ঘিরে রেখেছে আমাদের।

এখন কী করব? নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

কী করব এখন?

ষোলো

‘ওঠো, সুজা,’ দম আটকানো ফিসফিসে কণ্ঠে বললাম। ‘এখান থেকে পালাতে হবে আমাদের।’

কিন্তু দেরি করে ফেলেছি।

শক্ত হাতে আমার কাঁধ চেপে ধরল কতগুলো কঠিন আঙুল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, মিস্টার জোনস। চোখের পাতা সরু করে নিজের কবরফলকে নিজের নামের দিকে তাকিয়ে আছেন।

‘মিস্টার জোনস, আপনিও!’ ককিয়ে উঠলাম। এতই হতাশ, এতটাই ভয় পেয়েছি, অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা।

‘হ্যাঁ, আমিও,’ বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার জোনস। ‘আমরা সবাই।’ তাঁর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি যেন আমার চোখ ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে মগজে। ‘এক সময় একটা স্বাভাবিক শহরই ছিল

এটা। আমরাও স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম। আমাদের বেশির ভাগই শহরের ধারে প্লাস্টিক কারখানাটায় কাজ করতাম। তারপর একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটল। কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল এক ধরনের হলুদ গ্যাস। শহরের ওপরে অনেক সময় ধরে ভেসে থেকে, অক্সিজেন আটকে দিয়ে, আমাদেরকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারল। আশেপাশের শহরগুলো থেকে মানুষ এসে কবর দিল আমাদের। দিয়ে চলে গেল। কিন্তু কবরে গিয়েও শান্তি পেলাম না আমরা। ঘুমোতে পারলাম না। ওই গ্যাসের কারণেই হয়তো, পুরোপুরি মরিনি আমরা। গ্রীন ভ্যালি একটা জীবনুতদের শহরে পরিণত হলো। বাইরের কেউই জানে না এ খবর।’

‘আমাদেরকে কী করবেন এখন?’ ঢোক গিললাম। এত হাঁটু কাঁপছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। একজন মৃত মানুষ আমার কাঁধ চেপে ধরেছে। একজন মৃত মানুষ আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে। ভাবাই যায় না!

এত কাছে থেকে, তাঁর নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ পাচ্ছি আমি। মাথা ঘোরলাম। কিন্তু গন্ধটা থেকে মুক্তি পেলাম না। নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে গেছে।

‘আমার মা আর বাবা কোথায়?’ উঠে দাঁড়িয়েছে সুজা। মিস্টার জোনস সুজার দিকে তাকিয়ে আছে।

‘ভালই আছেন ওঁরা,’ মিস্টার জোনস বললেন। মুখে মৃদু হাসি। ‘এসো আমার সঙ্গে। ওঁদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।’

কাঁধ ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর আঙুলগুলো যেন আটকে গেছে আমার কাঁধে। চিৎকার করে বললাম, ‘আমার ভাইকে যেতে দিন!’

হাসিটা চওড়া হলো তাঁর। ‘ভয় নেই, রেজা, যতটা সম্ভব কম

কষ্ট দিয়ে মারা হবে তোমাদের,’ মোলায়েম, মসৃণ কণ্ঠে বললেন তিনি। ‘এসো আমার সঙ্গে।’

‘না!’ চেষ্টা করে উঠল সুজা। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততায় হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে টর্চটা তুলে নিল।

‘ওর মুখে আলো ফেলো, সুজা!’ চেষ্টা করে বললাম। ‘জলদি করো!’

মিস্টার জোনসের বিস্মিত মুখের দিকে টর্চটা তাক করল সুজা। সুইচ টিপে দিল।

কিছুই ঘটল না।

আলো জ্বলল না।

‘ভেঙে গেছে!’ ভাঙা গলায় সুজা বলল। ‘পাথরের ওপর পড়ে বাল্ব ভেঙে গেছে!’

হৃৎপিণ্ডটা যেন পাগল হয়ে গেছে আমার বুকের ভিতর। এত জোরে লাফাচ্ছে, থরথর করে কাঁপছি আমি।

ফিরে তাকালাম মিস্টার জোনসের দিকে। তাঁর মুখে বিজয়ের হাসি।



সতেরো

‘ভাল,’ হেসে সুজাকে বললেন মিস্টার জোনস, ‘চেষ্টা করা ভাল।’ হাসিটা দ্রুত মিলিয়ে গেল তাঁর মুখ থেকে।

পরিস্কার আলোয় এত কাছে থেকে তাঁর চেহারাটা আর তত ভাল লাগল না আমার কাছে। মুখের চামড়া শুকনো। চোখের নীচে খসখসে, জায়গায় জায়গায় চামড়া উঠে গেছে পেঁয়াজের খোসার মত।

‘চলো,’ আমাকে ঠেলা দিলেন তিনি। উজ্জ্বল হতে থাকা আকাশের দিকে তাকালেন। গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসছে সূর্য।

দ্বিধা করছে সুজা।

‘কী, যেতে বললাম না!’ ধমকে উঠলেন মিস্টার জোনস।

আমার কাঁধটা ছেড়ে দিয়ে সুজার দিকে এগোলেন।

নষ্ট টর্চটার দিকে তাকাল একবার সুজা। তারপর ছুঁড়ে মারল মিস্টার জোনসের মাথা লক্ষ্য করে।

মিস্টার জোনসের কপালে লাগল ভারি টর্চ। চামড়া কেটে গেল।

‘উহু!’ করে উঠলেন মিস্টার জোনস। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। হাত দিলেন কপালের কাটা জায়গাটায়। গর্ত হয়ে গেছে। কয়েক ইঞ্চি হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

‘পালাও, সুজা, পালাও!’ চৈচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু আমি বলার আগেই ঐক্যবৈক্যে দৌড়াতে শুরু করেছে সুজা, দুই সারি কবরফলকের মাঝখান দিয়ে। মাথা নিচু করে রেখেছে। আমিও ছুটলাম ওর পিছন পিছন। যত জোরে সম্ভব।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, টলতে টলতে আমাদের দিকে আসছেন মিস্টার জোনস। কাটা কপালে হাত চাপা দিয়ে রেখেছেন। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।

অনেক বেশি উজ্জ্বল আর আলোকিত হয়ে গেছে আকাশটা, তাঁর সহ্য-ক্ষমতার বাইরে। ছায়ায় থাকতে হয় তাঁকে।

পুরানো, উঁচু একটা মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভের আড়ালে লুকাল সুজা। একপাশে কাত হয়ে আছে স্তম্ভটা। মাঝখানে মস্ত ফাটল ধরেছে। ছুটতে ছুটতে আমি ওর পাশে এসে দাঁড়িলাম। এত বেশি হাঁপাচ্ছি, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঠাণ্ডা মার্বেলের গায়ে হেলান দিয়ে দুজনেই মুখ বের করে উঁকি দিয়ে তাকালাম মিস্টার জোনসের দিকে। আমাদের দিকে আর আসছেন না। গম্ভীর মুখে দ্রুত হেঁটে চলেছেন মঞ্চটার দিকে।

‘আমাদের দিকে আসছেন না,’ ফিসফিস করে বলল সুজা।
‘ফিরে যাচ্ছেন।’

‘রোদ সহ্য করতে পারছেন না,’ স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আমি।

‘ওই টর্চটাই ডোবাল,’ সুজা বলল। ‘নইলে এতক্ষণে হ্যারির
অবস্থা হতো।’

‘ও নিয়ে ভেবে আর এখন লাভ নেই!’ মিস্টার জোনসের
দিকে তাকিয়ে আছি। কাত হয়ে থাকা মস্ত গাছটার ওপাশে অদৃশ্য
হয়ে গেলেন তিনি।

‘দেখো, দেখো!’ আমার গায়ে গুঁতো দিল সুজা। ‘ওদিকে!’

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি, কতগুলো ছায়ামূর্তি
এগিয়ে চলেছে একসারি কবরফলকের পাশ দিয়ে। যেন মাটি ফুঁড়ে
বেরিয়ে এসেছে।

কবর থেকে উঠে এল নাকি? তা-ই হবে।

দ্রুত হেঁটে চলেছে ওরা। মনে হচ্ছে সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালের
ওপর দিয়ে ভেসে নেমে যাচ্ছে গাছের ছায়ার দিকে। নীরবে
এগিয়ে চলেছে সবাই, নজর সামনের দিকে। কেউ কারও সঙ্গে
কথা বলছে না। একটাই লক্ষ্য সবার, লুকানো সেই মঞ্চটা।
সুতোর টানে পুতুলের মত এগিয়ে চলেছে সবাই, যেন কোনও
অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ওদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

‘কেমন অদ্ভুত, তাই না!’ ফিসফিস করে সুজা বলল। মাথাটা
সরিয়ে আনল স্তম্ভের আড়ালে।

ছায়ার মধ্যে যেন ঢেউ তুলেছে কালো ছায়ামূর্তিগুলো। সুজা
ঠিকই বলেছে, দৃশ্যটা সত্যিই অদ্ভুত। দেখে মনে হচ্ছে
গোরস্থানের গাছপালা, কবরফলক, সব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। নতুন-

পুরানো সমস্ত লাশেরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে আউটডোর থিয়েটারে মিটিঙে চলেছে।

‘ওই যে এরিকা,’ ফিসফিস করে বলে আঙুল তুলে দেখালাম।
‘আর ওই টমাস। দলের বাকি ছেলেমেয়েরাও আছে।’

এক সময় এরা আমাদের বর্তমান বাড়িটাতে বাস করত।
এখন কবরের বাসিন্দা। গাছের ছায়ায় ছায়ায় আর সবার মতই
হেঁটে চলেছে ওরাও। দ্রুত। নিঃশব্দে।

হারি ছাড়া নিশ্চয় বাকি সবাই আছে এখানে, ভাবলাম।

হারিকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তাই আসতে পারেনি।
একজন মৃত মানুষকে আবার মারতে হয়—কী আশ্চর্য!

‘মা আর বাবা ওই অদ্ভুত মঞ্চটাতেই আছে! ওদেরকেই মারতে
যাচ্ছে ওই লাশের দল!’ সুজার কথায় অসুস্থ ভাবনার জগৎ থেকে
যেন বাস্তবে ফিরে এলাম। চলমান ছায়াগুলোর ওপর দৃষ্টি স্থির
হয়ে আছে ওর।

‘এসো,’ সুজার হাত ধরে টান দিলাম। ‘দেখতে হবে।’

শেষ ছায়ামূর্তিটাও গাছের ওপাশে চলে গেল। বন্ধ হলো
ছায়ার নড়া। আবার যেন স্তব্ধ হয়ে গেল গোরস্থানটা। নেমে এল
নীরবতা। মেঘমুক্ত নীল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ
শকুন।

ধীরে ধীরে, সাবধানে সুজাকে নিয়ে মঞ্চটার দিকে এগোলাম।
যতটা পারছি, স্তম্ভ আর গাছের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছি।

মনে হচ্ছে, চলাটাই যেন একটা কষ্ট। নিজের ওজন হয়ে
গেছে যেন আড়াইশো কিলোগ্রাম। বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড ভয় পা
আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। সেজন্যই এমন লাগছে।

তবে ভয় আমাদের আটকাতে পারল না। মা আর বাবাকে

দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি।

জানি, গোরস্থানের কতগুলো জীবন্যুত লাশের হাতে ওদেরকে বন্দি দেখতে একটুও ভাল লাগবে না আমার।

ভাল লাগবে না ওদের খুন হওয়া দেখতে।

কিন্তু তারপরেও যেতে হবে। ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

কাত হয়ে থাকা গাছটার কাছে চলে এসেছি। থেমে গেলাম। টেনে ধরে থামালাম সুজাকেও। মস্ত শিকড়গুলোর আড়ালে লুকালাম। নীচে মঞ্চের কাছ থেকে বহু কণ্ঠের গুঞ্জন কানে আসছে।

‘মা আর বাবা কি ওখানেই আছে?’ ফিসফিস করে বলল সুজা। গাছের আড়াল থেকে মুখ বের করে উঁকি দিতে গেল। তাড়াতাড়ি টেনে সরিয়ে আনলাম ওকে।

‘করো কী!’ ফিসফিস করে বললাম। ‘ভূতেরা দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে।’

‘কিন্তু বাবা-মা আছে কি না দেখা তো দরকার!’ সুজার চোখে আতঙ্ক দেখতে পাচ্ছি।

‘হ্যাঁ,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিলাম।

বিশাল, মোটা কাণ্ডটার পাশ দিয়ে সাবধানে উঁকি দিলাম দুজনে। নীচে তাকালাম। গাছের মাথা ঘন ছায়া সৃষ্টি করেছে মঞ্চের ওপর, রীতিমত অন্ধকার।

ওদেরকে দেখতে পেলাম।

মা আর বাবাকে।

দুজনের পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে পঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। হাত লম্বা করে গায়ের সঙ্গে বেঁধেছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে

নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে রয়েছে ওরা। ভীষণ অস্বস্তি আর আতঙ্কের মধ্যে। বাবার মুখ টকটকে লাল। মা'র চুল এলোমেলো। মুখের ওপর এসে পড়েছে।

আশেপাশে তাকিয়ে অন্ধকার ছায়ায় মিস্টার জোনসকে খুঁজলাম। একজন বুড়ো মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তাঁকে। মঞ্চ ঘিরে বানানো প্রতিটি বেঞ্চ ভর্তি করে লোক বসেছে। একটা বেঞ্চেরও কোথাও আর খালি নেই।

শহরের সবাই এসে হাজির হয়েছে, বুঝলাম। প্লাস্টিক কারখানার গ্যাসে যারা মারা গেছে।

‘মা আর বাবাকে মেরে ফেলবে ওরা,’ ফিসফিস করে বলল সুজা। আমার হাত আঁকড়ে ধরল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ও। ‘দুজনকে খুন করে ওদের মত জ্যান্তলাশ বানিয়ে ফেলবে।’

‘তারপর আসবে আমাদের ধরতে,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললাম। ‘বাবা-মা’ই হয়তো তখন নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে।’

তাকিয়ে আছি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে অসংখ্য নীরব দর্শকের সামনে। নিজেদের শেষ পরিণতির অপেক্ষা করছে।

‘কী করব?’ জিজ্ঞেস করল সুজা।

জবাব দিতে পারলাম না। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে আমার মগজে। মা আর বাবাকে বাঁচানোর একটা উপায় খুঁজছি।

‘কী করব?’ আবার জিজ্ঞেস করল সুজা। আমার হাতে শক্ত হলো ওর আঙুলের চাপ। ‘আমাদের চোখের সামনে ওরা মরে যাবে, আর আমরা কিছুই করব না...’

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িলাম দুজনে। কাণ্ডের মাথার

কাছে, ডালপালাগুলো শুরু হয়েছে যেখান থেকে। চাপ লেগে একটু যেন নড়ে উঠল গাছটা। তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চকিতে বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়।

‘মনে হয় বাঁচাতে পারব,’ গাছটার দিকে তাকিয়ে বললাম সুজাকে।

আমার হাত ছেড়ে দিল সুজা। অধীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

‘এই গাছটাকে ঠেলে ফেলে দেব,’ বললাম আমি। ‘গাছ না থাকলে ছায়া থাকবে না। রোদ পড়বে মঞ্চের চারপাশে।’

‘ঠিক!’ বলে উঠল সুজা। ‘আর ছায়া না থাকলে টিকতে পারবে না ও ভূতের দল। রোদে পুড়ে মরবে।’

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, ভাবলাম।

কাণ্ডের পাশ দিয়ে উঁকি দিলাম আবার। দর্শকরা সব উঠে দাঁড়িয়েছে। এগোতে শুরু করেছে। মা আর বাবার দিকে।

‘এসো,’ সুজাকে বললাম। ‘খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠব কাণ্ডের ওপর। এসো!’

কয়েক পা পিছিয়ে এলাম দুজনে।

যে ভাবে গাছটা কাত হয়ে আছে ঢালের গায়ে, শিকড়গুলো সব মাটি থেকে উঠে এসেছে, আমাদের ভার সহ্যে পারবে না।

কোনমতে মাটিতে ফেলে দিতে পারলেই হয়। ছায়া চলে যাবে। কড়া রোদ পড়বে থিয়েটারে। উজ্জ্বল, ঝকঝকে, সোনালি রোদ। আমাদের জন্য আনন্দের। ভূতগুলোর জন্য আতঙ্কের।

গলে শেষ হয়ে যাবে ওরা। ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমার মা আর বাবা বেঁচে যাবে।

আমরাও বাঁচব। আমি আর সুজা। চারজনেই বেঁচে যাব
আমরা।

‘সুজা, রেডি?’ ফিসফিস করে বললাম।

মাথা ঝাঁকাল ও। চোখে ভয়। কাটাতে পারছে না।

‘এক...দুই...তিন!’ চেষ্টা করে বললাম।

দৌড় দিলাম দুজনে। দুই হাত সামনে বাড়ানো। গতি
বাড়াচ্ছি দ্রুত।

গাছের কাছে এসে লাফিয়ে উঠলাম কাণ্ডের ওপর। জোরে
জোরে শরীর দুলিয়ে ঝাঁকি দিতে লাগলাম। প্রাণপণে। গায়ের
জোরে।

জোরে...জোরে...আরও জোরে।

কিন্তু সামান্য একটু নেমেই আবার লাফিয়ে উঠল গাছটা।

আর নীচে নামল না।



আঠারো

‘ঠেলা দাও!’ চেষ্টায়ে বললাম। ‘ঠেলো! আরও জোরে!’

ককিয়ে উঠল সুজা। অসহায় গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘পারছি না, রেজা! এতবড় গাছ
নড়ানোর সাধ্য আমাদের নেই!’

‘সুজা, হাল ছেড়ো না...’ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম।
‘মা আর বাবাকে বাঁচাতে হবে!’

গাছের গায়ে আবার ঝাঁকি দিল ও।

নিচ থেকে শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত, রাগত গুঞ্জন। সবাই
তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।

‘জলদি!’ চেষ্টায়ে বললাম সুজাকে। ‘জোরে দোলাও! আরও
জোরে! ফেলতেই হবে!’

আবার মাটিতে নেমে লাফিয়ে উঠলাম গাছের ওপর। ঝাঁকাতে শুরু করলাম। মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে আমাদের। কপালের শিরাগুলো লাফানো শুরু করেছে। গোঙানি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

‘ঝাঁকাও! ঝাঁকাও! থেমো না!’ আমি বললাম।

মনে হচ্ছে কপালের শিরাগুলো ফেটে যাবে আমার।

গাছটা নড়ছে কি?

না।

সামান্য একটু নড়ে সেই যে স্থির হয়েছে তো হয়েছেই।

নীচের গুঞ্জন জোরাল হচ্ছে।

‘পারব না আমরা!’ হতাশায় প্রায় কেঁদে ফেললাম। আত্মবিশ্বাস চলে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। ‘নড়াতে পারব না!’

গাছের ওপরই প্রায় বসে পড়লাম। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

হঠাৎ মোলায়েম একটা মড়মড় শব্দ কানে এল। টের পেলাম নড়ছে গাছটা। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নেমে এলাম গাছের ওপর থেকে। সুজাও নেমে পড়ল।

বাড়ছে শব্দটা। ভারি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প মাটি ফেটে দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

শিকড় উপড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ তুলে পড়ে গেল গাছটা। প্রথমে ঢালের ওপর আছড়ে পড়ল। মাটি কেঁপে উঠল।

মাথা নীচের দিকের করে খানিকটা পিছলে নেমে থেমে গেল গাছটা।

সুজার হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। অবাক বিস্ময়ে

তাকিয়ে দেখছি, আমার ধারণাই ঠিক, ছায়া সরে গিয়ে রোদ পড়েছে থিয়েটারে।

শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত চিৎকার। তীক্ষ্ণ। আতঙ্কিত। রাগত।

চিৎকারটা গর্জনে রূপ নিল। যন্ত্রণাকাতর, আতঁচিৎকার।

কবর থেকে উঠে আসা জীবন্যুত মানুষগুলোর গায়ে কড়া রোদ পড়েছে। সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে একে অন্যের গায়ের ওপর পড়ছে ওরা। চঁচামেচি, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি করে সবাই ঢাল বেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে। ছায়ায় চলে আসার জন্য মরিয়া। মাটিতে খাবার নখ বসিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেহটা টেনে তোলার চেষ্টা করছে কেউ কেউ।

কিস্তি দেরি করে ফেলেছে। কড়া রোদে চামড়া গলে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে দেহগুলো থেকে। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছি, কীভাবে দেহ থেকে মাংস খসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে আসছে।

নরকে পরিণত হয়েছে যেন জায়গাটা। বীভৎস দৃশ্য। তাকানো যায় না। অথচ চোখ সরাতে পারছি না।

এরিকাকে দেখতে পেলাম। এরিকা গারনার। বড়দের ভিড়ে ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঢালে উঠতে পারেনি। গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। চুলের বোঝা খসে পড়ল মাথা থেকে। বেরিয়ে পড়ল চামড়া গলে যাওয়া খয়েরি রঙের খুলি। আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। মনে হলো কৃতজ্ঞতা দেখলাম ওর দুই চোখে। বেশিক্ষণ টিকল না চোখ দুটো। কোটর থেকে বেরিয়ে ঝুলতে থাকল নাকের দুই পাশে। হাঁ করল। মাটির সমস্ত দাঁত খসে পড়ে গেছে। চঁচিয়ে বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রেজা! এক ভয়ানক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে! আর কোন কষ্ট থাকবে না!’

তারপর টলে পড়ে গেল ও ।

অসহ্য হয়ে উঠেছে লাশগুলোর চেষ্টামেচি । ভয়াল সেই আতঁচিকার সইতে না পেরে দুই কানে হাত চাপা দিলাম আমি আর সুজা । অন্য দিকে চোখ সরালাম ।

রোদের তেজে ধ্বংস হতে থাকল জীবনূত ভূতের দল ।

ধীরে ধীরে থেমে এল চিক্কার-চেষ্টামেচি । আবার যখন ফিরে তাকালাম, একটা দেহও আর আস্ত নেই । ঢাল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য হাড় ।

মঞ্চের ওপর তেমনি দাঁড়িয়ে আছে মা আর বাবা । চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ।

‘মা! বাবা!’ চেষ্টিয়ে উঠলাম ।

ওদের মুখে যে হাসিটা ফুটতে দেখলাম, জীবনে ভুলতে পারব না । মুক্ত করতে দৌড় দিলাম আমি আর সুজা ।

*

মুভারদের খবর দিল বাবা । ওরা এসে ভারি জিনিসগুলো নিয়ে যাবে । আপাতত আমাদের সঙ্গে নেবার মত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস খুব দ্রুত গোছগাছ করে নিল মা-বাবা । আমি আর জোস সাহায্য করলাম ওদের । আবার আমাদের পুরানো বাড়িটায় ফিরে যাব ।

‘ভাগ্যিস বেচে দিইনি,’ বাবা বলল ।

গাড়িতে উঠলাম । ড্রাইভওয়ায়েতে গাড়ি পিছাতে শুরু করল বাবা ।

‘একটু দাঁড়াও!’ আমি বললাম । কেন বলতে পারব না, কিন্তু হঠাৎ করেই পুরানো এই বাড়িটাকে শেষবারের মত কাছে থেকে দেখার ইচ্ছেটা দমন করতে পারলাম না ।

যেতে নিষেধ করল মা আর বাবা। শুনলাম না। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটলাম। উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকালাম নীরব, শূন্য, নীলচে-ধূসর ছায়ায় ঢাকা বাড়িটার দিকে।

এমন করে তাকিয়ে রইলাম, সম্মোহিতের মত। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারব না, ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার শব্দে যেন বাস্তবে ফিরলাম।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। আমাদের গাড়িটা বেরিয়ে গেছে। লাল রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে ওটার জায়গায়।

গাড়ির পিছন থেকে লাফিয়ে নামল দুটো ছেলে। একজন সুজার বয়েসী, অন্যটা তারচেয়ে ছোট। ওদের বাবা-মা'ও নামলেন। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। আমাকে দেখেছে বলে মনে হলো না।

‘কেমন লাগছে?’ হেসে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। ‘এটা এখন আমাদের নতুন বাড়ি।’

‘নতুন কোথায়? এ তো অনেক পুরানো,’ একটা ছেলে বলল। ‘জঘন্য!’

এতক্ষণে অন্য ছেলেটার চোখ পড়ল আমার ওপর। জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যাঁই, কে তুমি?’

ওর প্রশ্নটায় চমকে গেলাম। বললাম, ‘আমি...আমি তোমাদের এই বাড়িটাতেই থাকতাম!’ কানে বাজতে থাকল যেন এরিকা আর ভূত হয়ে যাওয়া অন্য ছেলেমেয়েগুলোর কণ্ঠ, ওরাও আমাকে বলেছিল: আমি তোমাদের এই বাড়িটাতেই থাকতাম!

রাস্তা থেকে বার বার হর্ন বাজিয়ে আমাকে ডাকছে বাবা। আর

দেরি করলাম না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিলাম রাস্তার দিকে।

বারান্দার দিকে চোখ পড়তে ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।
ক্লিপবোর্ড হাতে নতুন বাসিন্দাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, ও
কে? মিস্টার জোনস না?

উঁহু, মিস্টার জোনস নন, নিজেকে বোঝালাম। মিস্টার
জোনস হতেই পারেন না। আর সবার মত ধ্বংস হয়ে গেছেন
তিনিও। নাকি? রোদ থেকে সময়মত ছায়ায় আসতে পেরেছিলেন?

নিশ্চিত হতে পারলাম না।

কিছু ভাল করে দেখার জন্য ফিরে তাকানোরও সাহস হলো
না আর। সোজা এসে গাড়িতে উঠে টান দিয়ে দরজা লাগালাম।

চলতে শুরু করল আমাদের গাড়ি।

--: শেষ :-

হয়ে যাও রহস্যভেদী...

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো-দুনিয়া বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল নিখুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তীব্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে কল্পনার এই গোয়েন্দা আজ প্রায় একশত বছর ধরে বাস্তবের গোয়েন্দাদেরও নমস্য। তবে শুধু পর্যবেক্ষণই একজনকে তুখোড় গোয়েন্দা বানিয়ে দেবে, এটা ভাবা ভুল। ভাল রহস্যভেদী হবার জন্য পর্যবেক্ষণ গুণের সাথে সাথে তোমার থাকতে হবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রচণ্ড স্মরণশক্তি এবং অবশ্যই যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা। পড়তে হবে প্রচুর বই। থাকতে হবে আত্মবিশ্বাস। কিশোর ক্লাবে আমরা তোমাদের সুযোগ দিচ্ছি নিজেদের যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ঝালিয়ে নেয়ার। নিচের রহস্য কাহিনীটি পড় এবং এর সমাধান বের কর। সব নবীন রহস্যভেদীদের জন্য শুভ কামনা রইল।

ডরমিটরিতে দুর্ঘটনা

শামীম সুফী

ডাইনামিক ইউনিভার্সিটি। কক্সবাজার ক্যাম্পাস। শীতের ছুটি চলছে। ছাত্ররা তো বটেই শিক্ষকদেরও বেশির ভাগ যার যার মতন ক্যাম্পাস ছেড়ে ভ্রমণে কিংবা দেশের বাড়িতে বেড়াতে চলে গিয়েছেন। শুধু অবিবাহিত শিক্ষকদের ডরমিটরিতে চারজন শিক্ষক রয়ে গেছেন। চারদিকে যে ছুটির একটা আমেজ চলছে সেটা সম্ভবত তাদের কাউকে স্পর্শ করেনি। তারা চারজন বন্ধু মানুষ। প্রায় সমবয়সী। এবং চারজনই পড়াশোনার বাইরে আর কিছু তেমনটা বোঝেন বলে মনে হয় না।

হাসান ভূগোল পড়ান। বর্তমানে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি বই লেখায় ব্যস্ত। বইয়ের নাম- আধুনিক বাণিজ্যিক ভূগোল। তিনি থাকেন ডরমিটরির চার তলায়। চারশত চার নম্বর রুমে।

মুর্তোজা পড়ান কেমিস্ট্রি। তার ছাত্র নয় এমন কারো সাথে দেখা হলেও তিনি তাকে মেলামিনের গাঠনিক সংকেত বোঝানোর চেষ্টা করেন। নিজের রুমে তিনি ছোট খাট একটা ল্যাবরেটরী বানিয়ে নিয়েছেন। অবসরে রুমের মধ্যেই নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালান। তার রুম থেকে প্রায়ই বদগন্ধ

এবং বিভিন্ন রঙের ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ নিয়ে প্রতিবেশিরা বেশ বিরক্ত। তবে স্বয়ং ভিসি স্যার তাকে খুব পছন্দ করেন বলে কেউ তাকে তেমন ঘাটায় না। তিনি থাকেন তিন তলার সাত নম্বর রুমে।

তৃতীয়জন জব্বার নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক। প্রতি পাঁচটি বাক্যের মধ্যে তিনি দুটি নাটকের ডায়ালগ বলেন। তবে মানুষ হিসেবে পরোপকারী। নানান রকম সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করেন। ঘড়ি ধরে প্রতি চার মাসে একবার বিনামূল্যে রক্তদান করে আসেন। ডরমিটরিতে তার রুম নম্বর ‘দুই সতীন’ বা ২০৩।

চতুর্থজন ফরিদ প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক। একটু অহংকারী। কথা বলেন কম। অল্পতেই রেগে যান। বাংলাদেশের পাখি নিয়ে একটা গভীর গবেষণায় তিনি ইদানীং ভীষণ ব্যস্ত। থাকেন একতলার পাঁচ নম্বর রুমে।

এই চারজন মাঝে মাঝে চারশত চার নম্বর রুমে হাসানের কক্ষে আড্ডা দেন। তাস খেলেন এবং সিগারেট খান। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে ইন্টেলেকচুয়াল আড্ডা। আড্ডা শেষ হলে তারা রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

ছুটির পঞ্চম রাত। অমাবস্যা। নিকষ কালো অন্ধকার চারপাশে। ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের কারণে বিকেল থেকেই বিদ্যুত নেই ক্যাম্পাসে। মরার ওপর খাড়ার ঘায়ে মতো স্থানীয় দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে চরম মারামারির কারণে ক্যাম্পাসের বাইরে যুদ্ধাবস্থা চলছে। ক্যাম্পাসের বাসিন্দাদের বাইরে বের হবার উপায় নেই।

রাত তিনটা। ডরমিটরির বাসিন্দাদের সবাই চারতলার চারশত চার নম্বর রুমে জড়ো হয়েছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে। ভূগোলের শিক্ষক হাসানকে তার বিছানায় কে বা কারা হত্যা করে রেখে গেছে। হাসানের বকের বাম পাশে একটা ফুটো। ফুটোটা তৈরী হয়েছে সালফিউরিক এসিড থেকে। কেউ একজন হাসানকে ক্লোরোফরম দিয়ে ঘুমের মধ্যে অজ্ঞান করেছে। তারপর বকে সালফিউরিক এসিড ঢেলে দিয়েছে। এসিডের ছোট খালি বোতলটা এবং ক্লোরোফরম মাখানো রুমাল পড়ে আছে বিছানার পাশে।

হাসানের লাশটা প্রথম আবিষ্কার করেন ফরিদ। ঘুম না আসায় রাত আড়াইটার দিকে ফরিদ সিগারেট ধার করতে হাসানের রুমে আসেন। এসে দেখেন রুমের দরজা হাট করে খোলা। ফরিদের হাতে টর্চ ছিল। তিনি টর্চ

জেলে রুমে ঢুকে হাসানকে মৃত অবস্থায় পান। সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে যান এবং সবাইকে ঘটনা খুলে বলেন। ঘটনা জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা অফিসারকে। নিরাপত্তা অফিসার ফোন দেন পুলিশকে। ক্যাম্পাসের বাইরেই থানা। থানা থেকে ইন্সপেক্টর সাইদ ফোর্সসহ দশ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে চলে আসেন।

ইন্সপেক্টর সাইদ একজন তুখোড় গোয়েন্দা। বিদ্যুত না থাকায় চার ব্যাটারীর টর্চ এবং চার্জার লাইটের আলোতেই তাকে অনুসন্ধান কাজ চালাতে হচ্ছে। লাশটাকে তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। রিগর মরটিস বা লাশের শক্ত অবস্থা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন আনুমানিক রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে হাসানকে খুন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ডরমিটরির বাকি তিনজন বাসিন্দা ফরিদ, জব্বার এবং মূর্তোজার মধ্যে যে কোনো একজনের খুনী হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। তিনি তাদের তিনজনকে জেরা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাত সাড়ে তিনটা। ইন্সপেক্টর সাইদ প্রথমে জেরা করলেন কেমিস্ট্রির শিক্ষক মূর্তোজাকে।

‘রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন মিস্টার মূর্তোজা?’

‘আমি এ সময় ঘরে শুয়েছিলাম।’

‘ভাল করে ভেবে বলুন।’

‘ভাল করে ভেবেই বলছি।’

‘যে সালফিউরিক এসিডের বোতলটা জনাব হাসানের বিছানায় পাওয়া গেছে, সেটা কার সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?’

এই প্রশ্নে মূর্তোজা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ, ওটা আমারই। কিন্তু কীভাবে ওটা ওখানে গেল আমি তার কিছুই জানি না।’

ইন্সপেক্টর সাইদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, ‘কিন্তু আমি জানি। আপনি ওটা মিস্টার হাসানের ওখানে নিয়ে গেছেন এবং সুযোগ বুঝে তার বুকে এসিডটা ঢেলে দিয়েছেন।’

ইন্সপেক্টরের কথায় শিউরে উঠলেন মূর্তোজা। তার মুখ দিয়ে একটা আতর্জিৎকার বের হল-‘না’।

ইন্সপেক্টর আবার প্রশ্ন করলেন, ‘শেষ কখন হাসান সাহেবের সাথে আপনার কথা হয়?’

‘রাত সাড়ে ন’টায়। আমরা চারজন হাসানের ঘরে এক সাথেই ছিলাম। গল্প

করছিলাম। সাড়ে ন'টায় বিদায় নিয়ে চলে আসি। পানি না থাকায় রান্না করতে পারিনি। শুকনো খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর ফরিদের চিৎকারে রাত আড়াইটায় ঘুম ভাঙে।

ইন্সপেক্টর কিছুক্ষণ মূর্তোজার দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যান।'

ইন্সপেক্টর এরপর জেরা করলেন প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক ফরিদকে।

'আচ্ছা, আপনিই তো প্রথম আপনার বন্ধু মিস্টার হাসানকে মৃত শনাক্ত করেন। বলুন তো রাত আড়াইটার সময় কী এমন কারণে আপনাকে মিস্টার হাসানের রুমে আসতে হল?'

ফরিদ একটু রগচটা টাইপের। ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে ধাম করে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'কী বলতে চাইছেন আপনি, ইন্সপেক্টর?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি দুধের শিশু নন মিস্টার ফরিদ। কী বলতে চাইছি তা আপনি বুঝতে পারছেন। চটে উঠবেন না। অথবা চটে উঠলে আপনিই বিপদে পড়বেন।...ঠিক আছে, আপনি না বলতে চাইলে আমিই বলছি আসল ঘটনাটা কী হয়েছিল- রাত এগারোটার দিকে জনাব হাসানকে খুন করার পর আপনি ভাবতে বসলেন, কীভাবে নিজেকে সন্দেহের উর্দ্ধে রাখা যায়। অনেক ভাবার পর আপনার মনে হল হাসানের লাশটাকে যদি আপনিই আগে আবিষ্কার করেন, তাহলে খুব সম্ভাবনা যে অন্যরা আপনাকে সন্দেহের বাইরে রাখবে। তাছাড়া আপনি বুদ্ধি করে মূর্তোজা সাহেবের ঘর থেকে সালফিউরিক এসিডের বোতল আগেই সরিয়ে রেখেছিলেন। এসিড দিয়ে খুন করলে যেন খুনের দায়ভারটা জনাব মূর্তোজার কাঁধে চাপানো যায়- কী বলেন, মিস্টার ফরিদ?'

'একদম বাজে কথা। ননসেন্স। আপনাদের মাথায় দেখছি গোবর ভরা। এভাবেই আপনারা তদন্ত করেন নাকি? তাহলে তো সাধারণ মানুষের সর্বনাশ।' রাগে ফুঁসে উঠলেন ফরিদ।

'খেকিয়ে উঠবেন না মি. ফরিদ। আমরা আপনার রাগের ধার ধারি না। আপনি যদি খুন না করে থাকেন, তাহলে বলুন রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আপনি কী করছিলেন?'

'কিছুই করছিলাম না। কুয়াশা খাচ্ছিলাম। রাত জেগে পড়াশোনা করি। বিদ্যুত না থাকায় পড়তে পারছিলাম না। তাই হাত-মুখ ভালভাবে মাফলারে জড়িয়ে চাদরটা গায়ে চড়িয়ে বিল্ডিং এর সামনের রাস্তায় হাঁটাইটি করছিলাম। সাড়ে এগারোটার দিকে জব্বারের সাথে আমার দেখা হয়। পৌনে দশটার সময় সে যেন কাকে ক্যাম্পাসের মেডিক্যাল সেন্টারে রক্ত

দিতে গিয়েছিল। আমরা দাঁড়িয়ে দুই মিনিট গল্প করি। তারপর জব্বার তার রুমের দিকে রওনা হয়। আমি সিগারেট ধরিয়ে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে রুমে ফিরে আসি।’

ইন্সপেক্টর সাইদ এরপর জব্বারের জবানবন্দি নিলেন।

‘শেষ কখন আপনার সাথে মি. হাসানের কথা হয়?’

‘রাত সাড়ে ন’টায়। আমরা চারজন একসাথেই ছিলাম। তারপর সাড়ে ন’টায় যে যার রুমে ফিরে যাই।’

‘কী কথা হয়েছিল হাসান সাহেবের সাথে?’

‘ঠিক মনে নেই।’

‘রুমে ফিরে আপনি কী করলেন?’

‘বসেই ছিলাম। পৌনে দশটায় ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার থেকে একটা ফোন পাই আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারীর অসুস্থপচার হবে। ও নেগেটিভ রক্ত প্রয়োজন। বিদ্যুত নেই তাই জেনারেটর চালিয়েই অসুস্থপচার করা হবে। আমার রক্ত ও নেগেটিভ। আমি তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল সেন্টারে ছুটে যাই। পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। রক্ত দিয়ে সাড়ে এগারোটায় ফিরে আসি। পথে ফরিদের সাথে দেখা হয়। দু’মিনিট কথা বলে রুমে ফিরে আসি। কল ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নিই। ফ্রেস হয়ে মোমবাতি জ্বলে একটা নাটকের বাকি অংশ লেখায় হাত দিই। পৌনে একটা পর্যন্ত একটানা লিখে তারপর ঘুমুতে যাই।’

‘আপনি নাট্যকার?’

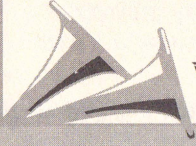
‘জী, আমি নাট্যকলা বিভাগে পড়াই। নাটক লিখি।’

‘খুনের জন্য আপনি কাকে সন্দেহ করেন?’

‘আমি কাউকেই সন্দেহ করি না। আমরা সবাই হাসানকে ভালবাসতাম। আমাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করতে পারে না।’

সবাইকে জেরা করার পর ইন্সপেক্টর খানিকটা সময় নিলেন ভাবার জন্য। সবার বক্তব্য মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলেন। হঠাৎ একজনের একটা অসঙ্গত কথা তার মনে পড়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন একজন তাকে মিথ্যা কথা বলেছে। নিজের অপকর্ম আড়াল করার জন্য বানিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভুল করে সে সেই অসঙ্গত কথাটা বলে ফেলেছে। তিনি সাথে সাথে তার ফোর্সকে সেই ব্যক্তিকে থ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন।

বলো দেখি বন্ধুরা, কে সেই খুনী? কীভাবে ইন্সপেক্টর বুঝতে পারলেন খুনী তাকে মিথ্যা কথা বলছে?



ক্যাথারিস পাবলিশিং এর
আরো একটি এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

যাহারা বিপদজনক ছাত্র

শামীম সুফী

রাজীব ক্লাস এইটের ফাস্টবয়। দেখতে ছোটখাট। তবে বুদ্ধি, সাহস এবং মারামারিতে অসাধারণ। তার একটা ইয়েলো বেস্টও আছে। সমস্যা একটাই- তার হাতের লেখা আর তেলাপোকার হাঁটার মধ্যে নাকি কোনো পার্থক্য নেই। টুকু মহাদুষ্ট বালক। মেলামেশা করে বড় বড় ছেলেদের সাথে। হাতের টিপ অসাধারণ। প্রায়ই পাড়ার বড় ভাইয়েরা তাকে ভাড়া করে নিয়ে যায় টার্গেটে গুলতি লাগানোর জন্য।

নজরুলের ওস্তাদি বানরের মতো কোনো কিছু বেয়ে ওপরে ওঠায়। তার মতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে পায়ে পা বেধে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এরচেয়ে পাইপ বেয়ে সুড়ুং করে নেমে পড়া ভাল।

তানভীর, সুহৃদ, আরিফুর-প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে এক্সপার্ট। আর সে কারণেই সবাই হেডসারের তালিকাভুক্ত বিপদজনক ছাত্র।

সন্ত্রাসীদের গডফাদার ভয়ংকর কিছলুর নির্দেশে স্কুলের ডজনখানেক প্রি-ফোরের বাচ্চাকে অপহরণ করা হলো মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে। ওদের পিছু নিল রাজীব। খবর পৌঁছালো হেডসারের কানেও। সবক'জন বিপদজনক ছাত্রকে জড়ো করে বাচ্চাদের উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়লেন তিনি। সামান্য ভুলে ওদের হাতে ধরা পড়ে গেল রাজীব। শেষ পর্যন্ত হেডসার ওদের উদ্ধার করতে পারবেন তো?

এক নিঃশ্বাসে শেষ করার মতো একটি চমকপ্রদ এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। আজই সংগ্রহ করো।

বন্ধু হও কিশোর ক্লাবের

সুমন থাকে কুষ্টিয়ায়, রোশনী খুলনায়, রাশেদ বরিশালে এবং মাহে নও ঢাকায়। তারা কেউ কাউকে চেনে না। তারপরও একটা অদৃশ্য সুতোর মেলবন্ধন কিন্তু তাদের সবার মধ্যেই রয়ে গেছে। বয়স যা-ই হোক না কেন, তারা সবাই কিশোর সাহিত্যের পাঠক। বন্ধনের এই অদৃশ্য সুতোটাকে দৃশ্যমান করে ফেললে কেমন হয়?

ফাটাফাটি হয়।

তাহলে এসো আমরা সবাই কিশোর ক্লাবের সদস্য হয়ে যাই।

এক কপি ছবিসহ নিচের সদস্য ফরমটি পূরণ করে পাঠিয়ে দাও 'ক্যাথারিসিস পাবলিশিং, ১৮২ ফকিরাপুল (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০'-এই ঠিকানা বরাবর। আমরা তোমাকে দেবো একটি সদস্য নম্বর। সদস্য নম্বরটি যত্ন করে রাখবে। নম্বর ধরে ধরে আমরা মাঝে মাঝেই তোমাদের খোঁজ খবর নেবো। জানতে চাইব পড়াশোনা কেমন হচ্ছে। ভাল করলে অভিনন্দন আর খারাপ করলে বকা থাকবে কপালে। সব ভাল কিছু আমরা ভাগাভাগি করব তোমাদের সাথে। তোমাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য থাকবে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা।

এসব কিছুতে আমাদের সাথে থাকবেন, তোমাদের প্রিয় রকিব হাসান। এসো তাহলে ফরমটি পূরণ করি।

বন্ধু নম্বর (ক্লাব কর্তৃক পূর্ণনীয়)

নাম

জন্মতারিখ

দিন

মাস

বছর

ঠিকানা

ই-মেইল

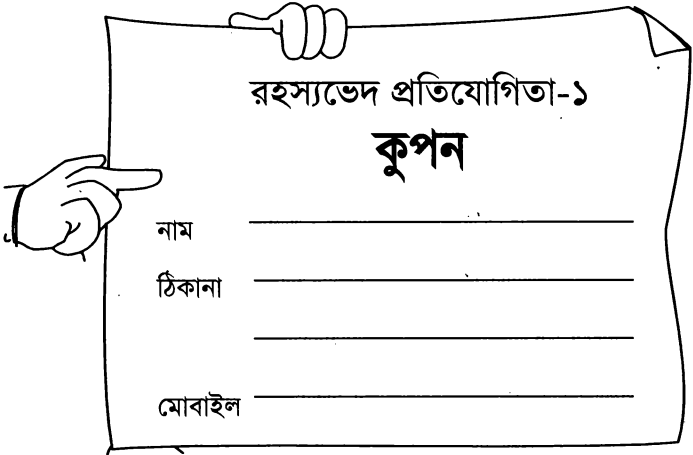
মোবাইল

রক্তের গ্রুপ

শখ

রহস্যভেদী প্রতিযোগীদের বলছি-

- ১) হাতের লেখা স্পষ্ট হতে হবে।
- ২) কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।
- ৩) প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে লিখতে হবে।
- ৪) সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর সঠিক হতে হবে। যে কোনো একটি বাদ গেলে, কিংবা ভুল হলে পুরোটাই ভুল হিসেবে ধরা হবে।
- ৫) বই থেকে কুপন ছিঁড়ে নিয়ে উত্তরের সঙ্গে পাঠাতে হবে। এক কুপনে শুধুমাত্র একজন উত্তর পাঠাতে পারবে।
কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
- আগামী ৩১ মার্চ ২০০৯ এর মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।
উত্তরের সাথে এক কপি ছবি পাঠালে ভাল হয়।
- ৬) সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারী করে প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। পরবর্তী 'কিশোর ক্লাব' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ীদের প্রত্যেকের ঠিকানায় পৌঁছে যাবে পাঁচশত টাকার প্রাইজবন্ড এবং লেখক স্বাক্ষরিত ক্যাথার্সিস প্রকাশিত তিনটি বই।
- ৭) এছাড়াও প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতার ছবিসহ নাম ছাপা হবে।



রহস্যভেদ প্রতিযোগিতা-১

কুপন

নাম _____

ঠিকানা _____

মোবাইল _____